বেনেতি বাগ

বাংলার শাকসজ্জী, গোসেবা, বাংলার মাটি, তূলার চাষ,
কলার চাষ, সরল কৃষিকথা, ইক্ষু চাষ, ফসলের
খাদ্য, মৎস্য বিজ্ঞান, আলুর চাষ,
কৃষি পঞ্জিকা প্রভৃতি বহু
কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা।

ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদার
প্রণীত

হিন্দুস্থান এজেন্সী

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—
দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল এণ্ড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃ।
কলিকাতা।

 [মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক :—
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, বি, এ।
হিন্দুস্থান এজেন্সী
৯নং ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।

দশম সংস্করণ

Printed by P. K. Bhattacharji
AT THE
GAROB PRINTING WORKS.
2/1, Mitra Lane,
CALCUTTA.

নিবেদন

দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই 'বেনেতি বাগের' নবম সংস্করণও নিঃশেষিত হইয়া গেল। দশম সংস্করণে 'পানচাষ' নামক মৎপ্রণীত পৃথক পুস্তকখানি সংযুক্ত করিলাম ও গোলমরিচের প্রবন্ধটি বৃদ্ধি করিলাম। আমার বিশ্বাস পাঠকগণের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে। আমাকে কৃষি বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রায়ই দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এ কারণে আমি নিজে বিশেষ কিছু দেখিতে পারি নাই হিন্দুস্থান এজেন্সীর শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এই সংস্করণ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া প্রুপ সংশোধনাদি কার্য্য করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

কিমধিকমতি—

বিনীত—
শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার

১০ই বৈশাখ,
১৩২৭ বঙ্গাব্দ

সূচীপত্র

বেনেতি বাগ

আদা।

"প্রতিদিন বাসী পেটে খেলে আদা নুন,
বৃদ্ধি পেতে থাকে তার পেটের আগুন।"

আমাদের দেশে আদা অনেকরূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা আদা অধিক পরিমাণে ঔষধে, এবং খাদ্য ও তরকারীতে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। আদার গুণ অনেক, যথা:— ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিকারক, বাত ও কফনাশক। সাধারণতঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আদার চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সাধারণতঃ উত্তর বাঙ্গালায় (রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায়) অধিক পরিমাণে আদা জন্মে। যশোহর, খুলনা, এবং ২৪ পরগণাতেও অল্প পরিমাণে আদার চাষ হইয়া থাকে। আদা, কাঁচা ও শুক্না দুই প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। বিলাতি শুঁট (Ginger) ও আমাদের দেশী আদাতে কিছুই প্রভেদ নাই। তবে কেন যে অনেকে বিলাতি শুঁঠ ব্যবহার করেন, তাহা বুঝিতে

পারি না। আদা যেরূপ উপকারী এবং সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থেরই আদার চাষে মনোযোগী হওয়া উচিত। আর বর্ত্তমান সময়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যেরূপ পুনর্জ্জীবিত হইতেছে, এবং সাধারণে বৈদেশিক চিকিৎসার (ডাক্তারি) অপেক্ষা দেশীয় চিকিৎসার প্রতি যেরূপ আস্থাবান্ হইতেছেন, তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায়, পুনরায় আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই বিস্তৃতি লাভ করিবে স্তুতরাং আদার প্রয়োজনও দিন দিন বাড়ীতে থাকিবে। নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী প্রভৃতিতেও আদার ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক চলিত হইয়াছে।

আদার চাষ করিতে হইলে প্রথমে মাঘ ফাল্গুন মাসে বড় কোদালী দ্বারা কোপাইয়া বা লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিয়া মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। পরে চৈত্রমাসের শেষে বা বৈশাখ মাসের প্রথমে তাজা আদার বীজ কিনিয়া বা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব প্রস্তুত জমিতে হলুদের পিলির ন্যায় ১॥০ হাত অন্তর এক একটি আদার পালসি বসাইয়া যাইবে। পরে দুই পিলির মাঝখান হইতে মাটি উঠাইয়া ঐ আদাগুলির উপর ৪।৫ অঙ্গুলি উচু করিয়া দিতে হইবে। কিছুদিন পরে যখন সমুদয় আদার গাছগুলি গজাইয়া ৫।৬ অঙ্গুলি লম্বা হইবে, তখন পিলির উপরে যে ঘাস গজাইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া মাঝখান হইতে মাটি উঠাইয়া ভাল করিয়া পিলি বাঁধিয়া দিতে হইবে।

আদাক্ষেত্রে যাহাতে গরু বাছুর প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ ভাবে বেড়া দিতে হইবে। আর বর্ষাকালে ক্ষেত্রের মধ্যে যাহাতে জল না বাধে, এমন করিয়া একটী নালা কাটিয়া রাখিতে হইবে। পরে মাঘ ফাল্গুন মাসে যখন আদার গাছ মরিয়া যাইবে, তখন আদা তুলিয়া ক্ষেত্রেই রাখিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে ক্ষেত্র হইতে আনিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। কাঁচা আদা বিক্রয় করিতে হইলে জলের ছিটা দেওয়া উচিত। আর শুঁঠ বিক্রয় করিতে হইলে, উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। আদা বিঘা প্রতি ১৬/০ হইতে ২৫/০ মণ পর্য্যন্ত ফলিতে পারে। সাধারণ বাজার দর ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা। এক বিঘার ১৮৲ টাকার অতিরিক্ত খরচ লাগে না। সুতরাং আদার চাষে খরচ বাদে মোট ১০০৲ টাকা বিঘাপ্রতি লাভ হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, দাসত্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেহই একাজ করিতে প্রস্তুত নহেন।

শুষ্ক আদারই নামান্তর শুণ্ঠি, আয়ুর্ব্বেদে ইহার পর্য্যায়ে বিশ্বভেষজ, মহৌষধ, শৃঙ্গবের প্রভৃতি নাম দেখা যায়; বস্তুতঃ ইহার গুণকারিতা এত অধিক যে অধিকাংশ ঔষধে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; এলোপ্যাথিক ও হাকিমীতেও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। ফরাসী ও আরবীতে ইহার নাম জিঞ্জিবিল, সম্ভবতঃ ইহা শৃঙ্গবের শব্দেরই অপভ্রংশ। এসিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের ৪।৫

হাজার ফিট উচ্চ ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়; বঙ্গদেশের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ২৪পরগা, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি জিলায় ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজের শার্ণদ (Shernad) জিলার শুঁঠ অতি উৎকৃষ্ট ও অধিকতর মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার আদি জন্মস্থান কোথায় নির্দ্দেশ করা কঠিন, কাহারও মতে চীনদেশ ইহার জন্মস্থান। শুনা যায় জবদ্বীপে (আধুনিক নাম জাভা Java) শৃঙ্গবের নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে এবং জাভাই ইহার জন্মস্থান। কেহ কেহ মালয় উপদ্বীপের রাজধানী শিঙ্গাপুর (Singapur) হইতে শৃঙ্গ বর নাম উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। যাহা হউক এ সকল প্রমাণদৃষ্টে ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান নয় বলিয়াই বোধ হয়। কথিত আছে ফ্রানসিস্কো ডি মেণ্ডোজা "Francisco de Mendoga" নামক জনৈক স্পেনীয় পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকা ও জ্যামেকাতে সর্ব্বপ্রকার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন। পাঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিমে স্থানে স্থানে আট হইতে বার আনা পর্য্যন্ত সের দরে আদা বিক্রয় হয়, সুতরাং ইহা মূল্যবান ইহার প্রভূত প্রয়োজন বলিয়া ইহার চাষ লাভজনক। পাটের চাষে লাভ আছে সত্য, কিন্তু পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক; শুঁঠ, পিপুল প্রভৃতির চাষে পরিশ্রম অল্প, অথচ লাভ প্রচুর। বিলাতের বাজারে ১ হন্দর (প্রায় ৫৬ সের) জামেকা শুঁঠের মূল্য ৫০।৬০

শিলিং। পূর্ব্বে ইহা ১৮০ শিলিং পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইত। জামেকার শুঁঠ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য হইলেও পরিমাণে অধিক উৎপন্ন হয় না, এজন্য বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষীয় শুঁঠের আদর ও আমদানী অধিক।

নিম্ন ভূমি, জলা, কঙ্করময় বা এঁঠেল মৃত্তিকাতে শুঁঠ আদৌ জন্মে না, তদ্ব্যতীত সকল প্রকার ভূমিতে উৎপন্ন হইলেও, কিছু এঁটেল মাটির ভাগ অধিক উচ্চ ও সরল দোয়াঁস মৃত্তিকা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। জঙ্গল কাটিয়া যে ভূমির নূতন পত্তন হইতেছে তাহাতেও ইহা সুন্দর জন্মে। ইহার চাষে প্রভূত জলের আবশ্যক হয়, এজন্য সরস ও সচ্ছিদ্র ভূমি (Well drained) মনোনীত করিতে হইবে। চৈত্র বৈশাখ মাসে হলদ্বারা ৫।৬ বার গভীর কর্ষণ ও চুর্ণ করতঃ তদবস্থায় রাখিয়া বৈশাখের শেষ দিকে আর একটী বৃষ্টিপাত হইলে পুনরায় কর্ষণ ও মই দিয়া সমতল করিতে হইবে, ইহার পর আর কর্ষণের আবশ্যক করে না। আদার ভূমি ১ হস্ত তিন পোয়া গভীর বর্ষিত ও সূক্ষ্ম চুর্ণিত হওয়া বিধেয়। অনেকে মনে করেন ইহার চাষে সার দেওয়া উচিত নহে; হলদ্বারা মৃত্তিকা উত্তমরূপে বিপর্য্যস্ত হইলেই হইল, কিন্তু এরূপ করিলে ফলন অল্প হয়, এইজন্য বিঘাপ্রতি ৩০।৪০ মন শুষ্ক ও পচা গোময় সার দিতে হইবে। ভূমিতে প্রথমবার হলকর্ষণ করতঃ সার ছিটাইয়া পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিলে সার মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের সত্ত্ব পোষ-

গোপযোগী হইয়া থাকে। বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমনের জন্য ক্ষেত্রটী একদিকে উচ্চ অপরদিকে কিছু নিম্ন এইরূপ ঢালুভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা অধিক জল সঞ্চিত হইলে আদা পচিয়া যাইবে। গাছ জলবসা জমিতে বিশেষ জোর করে না।

যে আদা ৫।৬ মাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত আছে, বীজের নিমিত্ত তাহাই ব্যবহার করা উচিত; পূর্ব্ব হইতে উত্তোলিত বাজারে বাত শুষ্ক আদার ভাল কলা (Bulb) বাহির হয় না। বীজের নিমিত্ত সংগৃহীত বাজারে আদার ২।৩ ইঞ্চি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া রোপনের ১৫ কিম্বা ২০ দিবস পূর্ব্বে আদ্র অথচ অন্ধকারময় স্থানে পল চাপা দিয়া রাখিতে হইবে অথবা স্বল্প গভীর খাদমধ্যে তুই ইঞ্চি আন্দাজ ছাই ছিটাইয়া তদুপরি ৩ ইঞ্চি দলভাবে আদা খণ্ড সকল রাখিয়া পুনরায় ছাই ও পোয়াল চাপা দিয়া উপর্য্যুপরি যতক্ষণ না খাদ পূর্ণ হয় এইভাবে সাজাইয়া সর্ব্বোপরি পোয়াল চাপা দিয়া কোন আবরণ দিতে হইবে। ১০।১৫ দিবসের মধ্যে আদার খণ্ড সমূহ হইতে ১ বা আধ ইঞ্চি পরিমাণ নূতন কলা বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্র হইতে সদ্য উত্তোলিত অদায় এ সকল প্রক্রিয়া করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাস বরাবর একটু বৃষ্টি হইলে সমস্ত ক্ষেত্রে কোদাল দ্বারা পংক্তিবদ্ধভাবে ১ হস্ত অন্তর ৫।৬ ইঞ্চি গভীর নালা

কাটিয়া তন্মধ্যে ২ বিঘত অন্তর আদা খণ্ড বসাইয়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে, অনেকে অর্দ্ধ হস্ত তিন পোয়া অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে বায়ু চলাচল রোধবশতঃ ফলন অল্প হয়। গাছ বাহির হইয়া যেমন তেজ করিতে থাকিবে, তেমনি হরিদ্রার দাঁড়া বাঁধার মত উভয় পংক্তি মধ্যস্থ মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা কাটিয়া গাছের গোড়ায় সরাইয়া দিতে হইবে, ইহাতে বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমেরও সুবিধা হয়। বর্ষায় বৃষ্টির প্রাচুর্ভাব অল্প হইলে নালার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ এই মুলজ উদ্ভিদ অতিরিক্ত জলে যেমন পচিয়া যায় আবার অল্প জলেও সেইরূপ আদৌ বৃদ্ধি পায় না। কোথাও কোথাও বড় বড় আলি না বাঁধিয়া ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করতঃ আলি বাঁধিয়া দেয়, ইহাতে ক্ষেত্রের সমস্ত জল খণ্ডে খণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় একেবারে বাহির হইবার সুবিধা পায় না, শোষিত হইয়া বহু বিলম্বে অতিরিক্ত জল বহির্গত হয়। হরিদ্রা সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডেই রোপিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্ত প্রণালী মত আদা অতি সুন্দর ও অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। বর্ষার জলে গাছ সতেজ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এসময়ে মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং আইল মেরামত ও গাছের গোড়ায় মাটী ধরান ভিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্যক হয় না।

ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর ও উত্তমরূপ প্রস্তুত হইলে তবে

আশ্বিনের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্রটী ১॥০ দেড় কিম্বা ২ হস্ত উচ্চ গাছে পরিপূর্ণ হইয়া যায় মৃত্তিকা প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। এই সময় আর একবার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নিড়াইয়া দিতে পারিলে আদার নূতন ও কোমল কন্দগুলি (Rhizomes) মাটি আল্‌গা পাইয়া ও বায়ূর অভ্যন্তর প্রবেশ হেতু আকারে বৃহত্তর ও সুপুষ্ট হইয়া থাকে। আদা সুপুষ্ট ও পরিমাণে অধিক জন্মিলে অনেক সময় ক্ষেত্রের দাঁড়ার মৃত্তিকা অল্প বিস্তর ফাটিয়া যায়। পৌষ মাঘ মাসে শীতের প্রকোপে গাছ শুষ্ক হইয়া আইসে, এ সময়ে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ পাতাগুলি ঝরিয়া যাইবার ১০।১২ দিবস পরে কোদাল দ্বারা দাড়াগুলি ভাঙ্গিয়া আদা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

মাদ্রাজের অন্তর্গত শার্ণদ জিলায় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শুঁঠ উৎপন্ন হয়। এই জিলার ভূমি স্বভাবতঃই আদা চাষের উপযোগী ও এখানকার মপলারা চৈত্র বৈশাখ মাসে ভূমি প্রস্তুত করে। তৎপরে ৮×২॥ হাত চৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ৯ ইঞ্চি অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত কাটিয়া সার মিশাইয়া দেয়, পরে জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষণ হইলে ভূমি হইতে মূল সকল উঠাইয়া দুই ইঞ্চি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া এক একটি গর্ত্তে রোপণ করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিয়া তদুপরি কোন গাছের কাঁচা পাতা স্থূলভাবে আবরণ দিয়া থাকে। ইহাতে পাতাগুলি, অল্পদিনের মধ্যে

পচিয়া সারের কার্য্য করে। এই বিশেষজাতীয় বৃক্ষপত্র ঐ জিলাতেই পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও বৃক্ষপত্র সারের ব্যবহার করিলে কীট জন্মিয়া ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করিতে পারে বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। শার্ণদের আদার চাষের এইটুকুই বিশেষত্ব, অবশেষে শুঁঠ প্রস্তুত অপরাপর সমস্ত পাইট ও প্রণালী অন্য দেশের মত।

শুঁঠ প্রস্তুত—উত্তোলিত আদা জলে ধৌত করতঃ ছুরিকা দ্বারা শিকড় ও ত্বকভাগ উত্তমরূপ চাঁচিয়া পুনরায় একখানি শণ নির্ম্মিত চটের উপর মাজিয়া ঘসিয়া অবশেষে নির্ম্মল জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া প্রখর রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিতে হইবে। শুঁঠের অভ্যন্তর ভাগ শ্বেতবর্ণ চুর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে; একটু যত্নপূর্ব্বক সুপুষ্ট আদার উপরকার ত্বকভাব সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলিলে উহা দিব্য শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ও ত্বক কুঞ্চিত হইবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ জল যত নির্ম্মল হইবে এবং পুনঃ পুনঃ যত পরিষ্কার রূপে ধৌত করা যাইবে শুঁঠ ততই শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। মেঘাবৃত দিবসে বা রাত্রে অনাবৃত অবস্থায় শিশিরে ফেলিয়া রাখিলে শুঁঠ খারাপ হয় ও বর্ণের মালিন্য ঘটে, এজন্য দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ রাত্রে উঠাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে সপ্তাহ-কাল মধ্যে শুষ্ক হইবার পর ইহাকে আর একবার উপর মাজিয়া ঘসিয়া ধৌত, পরিস্কৃত ও শুষ্ক করিয়া লওয়া আব-শ্যক। অতঃপর বস্তাবন্দী অবস্থায় দুইমাসকাল ঘরে রাখিয়া

পরে বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা যাইতে পারে। শুঁঠের মধ্যে যে গুলি অপুষ্ট ও হাল্‌কা এবং যাহা অনেক দিবস অযত্নে রক্ষিত হয় তাহা শীঘ্রই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এজন্য বিশেষ যত্নের সহিত শুঁঠ বস্তাবন্দী করিতে হইবে। শুঁঠ যত ভাল শুষ্ক মসৃণ ও পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ হইবে মূল্য তদনুযায়ী অধিক হইবে। দেখাও যায় মৃত্তিকা ও চাষের তদ্বিরের অপেক্ষা এই প্রস্তুত প্রণালীর তারতম্যে শুঁঠের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি চারি হইতে ছয় মণ পর্য্যন্ত শুঁঠ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জামেকাতে বিশেষ যত্নে রোপিত ক্ষেত্রে একর প্রতি ২০০০ পাউণ্ড ফলন হয় এরূপ শুনা গিয়াছে।

সুপক্ক আদা ভূমি হইতে উঠাইয়া উষ্ণজলে সিদ্ধ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা উষ্ণ বর্ণ হয়; কিন্তু উপরকার ত্বক্‌-ভাগ চাঁচিয়া জলে ধৌত করতঃ শুষ্ক করিলে শ্বেত বর্ণ ধারণ করে; ইহাই যুক্তিযুক্ত, কারণ অনেক উদ্ভিদবিৎ শ্বেত ও উষ্ণ ভেদে আদা তুই জাতীয় উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশে যে শুঁঠ উৎপন্ন হয় উহা প্রায়ই মেটে আদাটে বর্ণের কর্কশ ও কুঞ্চিগাত্র অর্থাৎ ত্বক ভাব ভালরূপ পরিস্কৃত না হওয়ায় এবড়ো হয়; চূর্ণ করিলে অতি তীব্র অথচ মনোহর ঔষধিগন্ধ ঈষৎ শ্বেত বর্ণ চূর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাজারে ইহা ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। নেপালের অন্তর্গত হালটা, বুটোল, তানসেন এবং গোরখপুরের বাহাতুর-

গঞ্জ, তুলসীপুর, নৈপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হিমালয়জাত এক প্রকার জর্দা রঙ্গের শুঁঠের আমদানী দেখা যায়, ইহা অত্যন্ত মলিন, কুঞ্চিত কর্কশ ও অপেক্ষাকৃত হীনগুণ বিশিষ্ট।

আদার উপযুক্ত জমি—বেলে দোঁয়াশ।

আদার সার বিঘা প্রতি—নাইট্রোজেন ১২ পাউণ্ড।

পটাশ—৩২ পাউণ্ড, ফস্ফরাসিক্ এসিড্—৩২ পাউণ্ড।

চাষের খরচ ঃ—

বিঘাপ্রতি খরচ—২০৲

আয়—১২০৲ টাকা

আম আদা

ইহা আদা জাতীয় উদ্ভিদ, মূল ও পাতার আকার হলুদের ন্যায়। তবে ইহাতে কচি আমের ন্যায় গন্ধ অনুভূতি হয় এই মাত্র প্রভেদ। এই জন্যই ইহার নাম আম আদা হইয়াছে। আম আদা হইতে নানাপ্রকার মুখরোচক চাটনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার চাষপ্রণালী বীজ ও ফসলের পরিমাণ আদারই অনুরূপ।

হলুদ—হরিদ্রা

বৈশাখ জৈষ্ঠ্যেতে হলুদ রোও ॥
দাবা পাশা খেলা ফেলে থোও।
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি।
ভাদ্দরে নিড়ায়ে করিবে খাঁটি।
অন্যথা নিয়মে পুতলে হল্‌দি।
পৃথিবী বলেন তাতে না ফলদি। (খনা)

হরিদ্রার নাম—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা নিশাবাচকশব্দ, বরবর্ণনী, ক্রিমিঘ্না, হলাদ, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী।

১। হরিদ্রার গুণ—আমরা পাক করিবার সময় মাছে, তরকারীতে ও ডাইলে হলুদ ব্যবহার করিয়া থাকি, সাধারণে হরিদ্রার এইমাত্র ব্যবহারই জানেন। কিন্তু হরিদ্রা একটি মহৎ উপকারী বস্তু। নানা কঠিন পীড়ায় হরিদ্রা ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হরিদ্রা—কফ্, বায়ু আশ্রিত কুষ্ঠ, কুণ্ড এবং ব্রণ, ইত্যাদির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাজবল্লভ গ্রন্থ মতে হরিদ্রা শোথ রোগেও একটি উত্তম ঔষধ। শোথ রোগে ডাক্তারি মতে আজকাল হরিদ্রার ব্যবহার হইতেছে। হরিদ্রার যে কৃমি নষ্ট করিবার একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাহা

পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ ললনাগণও অবগত আছেন। শিশুদিগের কৃমি হইলে সচরাচর গুড়ের সহিত কাঁচা হলুদ খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। অভিধানে হরিদ্রার অপর নাম বর্ণবতী। অনেক দেশের স্ত্রীলোকগণ কাঁচা হলুদ গাত্রে মাখিয়া স্নান করতঃ এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। আজকাল ডাক্তারী পুস্তকেও হরিদ্রার গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ হইয়াছে। ডাক্তার রমফিস সাহেবের মতে সকল প্রকার চর্ম্মরোগের পক্ষেই হরিদ্রাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তারি মতে হরিদ্রা আগ্নেয় অর্থাৎ ইহা হইতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কোন কোন ডাক্তার বলেন কাঁওয়া ও বহুমূত্র রোগীর পক্ষে হরিদ্রা বিশেষ উপকারী। ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে কাঁচা হরিদ্রার রস কৃমির জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন পরন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে কঠিন নাকের ঘা ইত্যাদির পক্ষে হরিদ্রার ছাই একটী মহৌষধ। হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ছাই মার্গছা তৈল একত্রে মিশাইয়া নাকে দিলে যে প্রকার নাকের ঘা হউক প্রায়ই আরোগ্য হয়। বিলাতের বৈজ্ঞানিকেরা ও ডাক্তারেরা হরিদ্রার সাহায্যে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আহারের কোন বস্তুতে কিম্বা কোন ঔষধে প্রস্রাবে বা জলে সারক পদার্থ আছে কি না তাহা পরীক্ষার জন্য "টারমেরিক" নামক যে কাগজ ব্যবহার হয়,

তাহা হরিদ্রার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরিদ্রা কাগজে মাখাইয়া তাহা বাতাসে শুকাইয়া সেই কাগজ কোন বস্তুর মধ্যে দিলে যদি লাল কটা রং হয়; তবেই বুঝা যায় তাহাতে ক্ষার পদার্থ আছে। বিখ্যাত ডাক্তার রট্‌লি সাহেব নানা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া হরিদ্রার এই কয়েকটি গুণ স্থির করিয়াছেন—কটু হরিদ্রার রস তিক্তস্বাদ গন্ধযুক্ত, উত্তেজক, বলকারক, উদরের শীড়ানাশক, সবিরাম জ্বর নিবারক, এবং উদরী-পীড়ানাশক, দেহের বর্ণকারক, উষ্ণ বীর্য্য, রুক্ষ, শোধন ও স্ত্রীলোকের ভূষণ। হাকিম-গণের মতেও হরিদ্রা অনেক পীড়ার ঔষধ; প্রমেহ পীড়ায় সর্ব্বদাই তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। হরিদ্রা যে কেবল ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার হয় এমন নহে, ইহার আরও অনেক গুণ আছে। হরিদ্রা কুমিরের পক্ষে ভয়ানক বিষ, কোনপ্রকারে কুমীরের গাত্রে একটু প্রবেশ করিলেই কুমীর মরিয়া যায়, একারণ শিকারীগণ গুলিতে হরিদ্রা মাখাইয়া বন্দুকে ব্যবহার করেন। হরিদ্রার গন্ধে কুমীর পলায় বলিয়া কুমীরভরা নদীতে হরিদ্রা গাত্রে মাখিয়া স্নানে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। একারণ দাক্ষিণাত্যের লোকেরা গাত্রে হরিদ্রা ব্যবহার করে। সাপও হরিদ্রার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না।

হরিদ্রা সমস্ত প্রকার পোকা নষ্ট করে, হরিদ্রা পচা নিবারণ করে। এজন্য চামারেরা চাম প্রস্তুত করিতে হলুদ

ব্যবহার করে। অনেকে গোলাপ ইত্যাদি গাছের চারা রোপন করিয়া উইয়েরও অন্যান্য পোকার উপদ্রবে বহু কষ্ট পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি হলুদ গুলিয়া পিচকারী দ্বারা গাছে ও মাটিতে ছিটাইয়া দিয়া রোপন করেন তবে পোকায় আর গাছ নষ্ট করিতে পারে না।

২। হরিদ্রার ব্যবসা—হরিদ্রার গুণও যেরূপ ইহার ব্যবসায় লাভও তেমনি প্রচুর। যত্ন করিয়া হরিদ্রার চাষ করিলে বিঘা প্রতি খরচ বাদে ৮০৲ হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশ হইতে পশ্চিমে হরিদ্রা রপ্তানি হয়। এদেশ হইতে বিদেশে এখনও অধিক পরিমাণে যাইতে পারিতেছে না। চীন ও জাপান দেশেও ইহার আবাদ হয়। ব্যবসার জন্য দুই প্রকার হরিদ্রা প্রস্তুত হয়। এক প্রকার—ইহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করিতে হয়। আর এক প্রকার—ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া চিনি বা লবনের মত বস্তাবন্দী করিয়া ব্যবসার জন্য চালান দেওয়া হয়। এই প্রকার হরিদ্রার মূল্য অধিক; কিন্তু প্রথম প্রকারের হরিদ্রা অধিক দিন ভাল অবস্থায় থাকে।

৩। হরিদ্রার জাতিভেদ—আমাদের দেশে চারিজাতির হরিদ্রা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—পাকালিয়া, কাজলা, হুকমো, ও বাঘহাতা। ইহার মধ্যে প্রথম দুইজাতীয় হরিদ্রাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাছাড় অঞ্চলে “কামরাঙ্গা” নামক

এক জাতীয় হরিদ্রা পাওয়া যায়। ঐ হরিদ্রা মোটা বটে, কিন্তু সিদ্ধ করিলে শুঁঠ প্রস্তুত হয় না। কাঁচা বেলায় উহার রং ঠিক চীনে সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখায়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছাচি, বাঘনালি, বয়ারবাট, আদাগেঁটে, খেজুরছড়ি ইত্যাদি নানা নামে নানা জাতীয় হরিদ্রা জন্মে।

৪। হরিদ্রার ক্ষেত্র নিরুপণ—দোয়াঁশ বেলে মাটি হরিদ্রা ক্ষেত্রের উপযুক্ত ভূমি, মেটেল অথবা একেবারে বালি মাটিতে হরিদ্রার চাষ ভাল হয় না। অধিক দিনের পতিত জমিতে উত্তম হরিদ্রা জন্মে। অধিক দিনের পতিত জমি না পাওয়া গেলে, অন্ততঃ ৪।৫ বৎসরের পতিত জমিতেও হরিদ্রা মন্দ হয় না। যে জমি বন্যার জলে ডুবিয়া যায় অথবা যাহাতে বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে সে প্রকারের জমিতে কখনই হরিদ্রা হইতে পারে না, কারণ হরিদ্রা গাছের নীচে জল বাধিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় অতএব যাহাতে হরিদ্রা গাছের নীচে জল জমিতে না পারে এরূপ উচ্চ ভূমিতে চাষ করাই কর্ত্তব্য।

৫। সময় নির্ব্বাচন—(বৃষ্টি হইলে) ১৫ই বৈশাখের পর হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত হরিদ্রা রোপনের উৎকৃষ্ট সময়। ইহার পরে হরিদ্রা রোপণ করিলে গাছ নিস্তেজ হয়, সুতরাং তাহার নীচে আশানুরূপ হরিদ্রা জন্মে না।

৬। সার কথন—পতিত ক্ষেত্রে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, স্বভাবতঃই তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ওলামাটি, পচাপাতা, পচাখড়, হরিদ্রা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম সার, গোবর সার নিষিদ্ধ কারণ ইহাতে "কড়া পোকা" ক্ষেত্রে জন্মিয়া চারা কাটিয়া দেয়, আর পোকা না হইলেও গাছ শীঘ্র বড় হইয়া যায়, সেইজন্য হরিদ্রার পরিমাণও কম হয়, যাহা হয়, তাহাও মোটা হইয়া পড়ে এবং তাহাতে জলীয় অংশ বেশী থাকে, কাজেই ফলন কমিয়া যায়। (নাইট্রোজেন ১৬ পাঃ পটাস ৩০ পাঃ)।

৭। চাষ প্রণালী—যে জমিতে হলুদের চাষ করিতে হইবে, তাহা অন্ততঃ এক ফুট করিয়া খনন করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ঐ জমি কোদাল দ্বারা একবার কোপাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পর ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে দোকোপা করিয়া তাহার উপর উপর ৩।৪ বার মই দিয়া জমি সমতল করিয়া লইতে হয়। হরিদ্রার জমিতে কিছু কিছু ঢেলা থাকা আবশ্যক, কারণ "ঢেলা" থাকিলে জমি ফাঁপ থাকে, সুতরাং হরিদ্রাও ভাল জন্মে। লাঙ্গল দ্বারা চাষ না করিয়া কোদাল দ্বারা কোপাইয়া জমি প্রস্তুত করতঃ হরিদ্রা রোপণ করাই প্রশস্ত।

৮। বীজ কথন—হলুদের মোথাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোথার অভাবে বড় মুখী দ্বারাও বীজ করা

যাইতে পারে। মুখী দ্বারা বীজ করা হইলে, তাহার গাত্র-সংলগ্ন ছোট ছোট মুখীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। মোথার অপেক্ষা মুখীর বীজে হরিদ্রা কম জন্মে।

৯। রোপণ পদ্ধতি—জমি প্রস্তুত হইলে, তাহার এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক হাত অন্তর ৫।৬ অঙ্গুলি গভীর করিয়া সোজাসুজি জুলি কাটিয়া,—তাহার মধ্যে ১৫।১৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটী বীজ ফেলিয়া তাহার উপর ৩।৪ অঙ্গুলি মাটি চাপা দিতে হয়। কৃষকেরা জুলি কাটা ও হরিদ্রার বীজ রোপণ এক সঙ্গেই করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে একটী জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে বীজ ফেলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় জুলির মাটি প্রথম জুলিতে রোপিত বীজের উপর চাপা দেয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একটী রোপণের কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়। হরিদ্রার জমিতে দীর্ঘ ও প্রস্থে এক ফুট নালা কাটিয়া দিয়া তাহা কতকগুলি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। এইরূপ করিলে জমি হইতে সহজেই জল বাহির হইয়া যায়, এবং জমিও বেশ শুক্‌না থাকে। হরিদ্রার জমি যত শুক্‌না থাকে ততই ভাল। কোন কোন স্থানে দৈর্ঘ্য প্রস্থে আধহাত অন্তর ঐরূপে হলুদের বীজ রোপণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা ভাল ব্যবস্থা নহে। ইহাতে গাছ অত্যন্ত ঘন ঘন হয়, এবং হরিদ্রা কম জন্মে। বিশেষতঃ হরিদ্রা তুলিবার সময় কোদালের

কোপ লাগিয়া অনেক হরিদ্রা কাটিয়া যায়। হরিদ্রা গাছের গোড়ার দাঁড়া (আইল) বাঁধিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দাঁড় বা আইল বাঁধিয়া না দিলে গাছের গোড়ায় জল বসিয়া গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজ রোপণ করিয়া তাহার উপরকার মাটিগুলি হাত দিয়া সমান করিয়া না দিলেও চলে। ক্ষেত্রে যে ছোট ছোট ঢেলা থাকিবে তাহা বৃষ্টির জলে গলিয়া গিয়া আপনা আপনি মাটি সমান হইয়া চারা বাহির হইলে, এক মাস পরে একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। প্রথমবার নিড়ানের ২০।২৫ দিন পরে পুনরায় নিড়ান উচিত, কারণ হরিদ্রা ক্ষেত্রে ঘাস হইতে দেওয়া উচিত নহে! দো-নিড়ানের পরে হরিদ্রার গাছে আইল বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। আইল বাঁধিবার জন্য গাছের মধ্যে মধ্যে যে জুলি কাটা হইবে, তাহার গভীরতা যেন আধ হাতের অধিক না হয়। গাছ বড় হইলে তাহার নীচে ঘাস জন্মিতে পারে না; জন্মিলেও আপনি মরিয়া যায়। যদি নিতান্তই অধিক ঘাস জন্মে তবে তাহা হাত দিয়া ছিঁড়িয়া দিলেই হইবে। ইহার পর হরিদ্রা ক্ষেত্রের আর কোন বিশেষ কাজ নাই; কেবল গরু বাছুর যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তদ্রূপ বেড়া দেওয়া উচিত।

১০। হরিদ্রা-উত্তোলন—মাঘ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে হরিদ্রার গাছগুলি শুকাইলে তাহা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত

করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক আইল বা পিলির ফাঁকে ফাঁকে কোপাইয়া হরিদ্রা তুলিবে. এবং তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হরিদ্রার মোথা ও মুখীগুলি পৃথক করিয়া লওয়া আবশ্যক। মোথাগুলির গায়ে যে মাটি লাগিয়া থাকে, তাহা এই সময় উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইতে হয়, এবং তাহা বীজের জন্য কোন বৃক্ষের ছায়ায় অথবা কোন শীতল স্থানে গাদা করিয়া পোয়াল (খড়) চাপা দিয়া রাখিতে হয়।

১১। সিদ্ধ ও শুষ্ক প্রণালী—হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তাহার শুঁঠ প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন কার্য্য। কিরূপে সিদ্ধ করিতে হয়, এবং সিদ্ধ হরিদ্রা কিরূপেই বা শুকাইতে হয় তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা যেন কেবলমাত্র পুস্তিকা পাঠ করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। সিদ্ধ করিবার সময় এদিক ওদিক করিয়া একটু "তাক" খারাপ হইলেই সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। হরিদ্রা কম সিদ্ধ হইলে "দরকোচা" মারিয়া যায়, শুঁঠ প্রস্তুত হয় না; এবং অধিক সিদ্ধ হইলে, রঙ্ জ্বলিয়া যায়, সুতরাং মালের ফলন হয় না।

হরিদ্রা সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে নাদা, ঝুড়ী ও তেকাটা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই গুলি হরিদ্রা সিদ্ধ করিবার প্রধান উপকরণ। যে স্থানে হরিদ্রা সিদ্ধ করার উনন (আখা) কিম্বা বাইন্ কাটা হইবে, তাহার অনতিদূরে

নাদা পাতিয়া তাহার উপর তেকাটা ও ঝুড়ী বসাইয়া রাখিতে হয়। মাঝারী রকমের "তোলা" হাড়ীই হরিদ্রা সিদ্ধ করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। প্রথমতঃ হাড়ির-চারি ভাগের তিন ভাগ হরিদ্রা পূর্ণ করিয়া, তাহাতে গোবর মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিতে হয়। ঐ জল যেন হরিদ্রার তিন অঙ্গুলি নীচে থাকে। হরিদ্রার সমান সমান জল দেওয়া কিংবা জল দিয়া হলুদ ডুবাইয়া দেওয়া উচিত নহে। জল দিতে দিতে যখন উৎলাইয়া উঠিবে, সেই সময় একটি কাঠির দ্বারা হরিদ্রাগুলি একটু ঠাসিয়া দিয়া তাহা হইতে নামাইয়া ঝুড়ির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢালিয়া দিতে হইবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই যে হরিদ্রা সিদ্ধ হইল এমত নহে, ঐ গরম জলের "ভাপ" সমুদয় হরিদ্রার উপর লাগিয়াছে কিনা, ইহা দেখিয়া তবে উনন হইতে হরিদ্রা নামাইতে হইবে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে গরম জলের "ভাপ" উপরকার হরিদ্রায় ভাল করিয়া লাগে নাই, তাহা হইলে আর একবার উৎলাইলে নামাইতে হয়। দুইবারের অধিক জল উৎলাইতে দেওয়া উচিত নহে। হরিদ্রা সিদ্ধ হইয়া গেলেই তাহা তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ ঝুড়ির মধ্যে ঢালিয়া ফেলা যাইতে পারে। তৎপরে সমস্ত সিদ্ধ হরিদ্রাগুলি এক স্থানে গাদা করিয়া প্রথম দিন চেটাই কিম্বা ছালা দিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনে ঐ সিদ্ধ হরিদ্রা কোন ঘাস যুক্ত স্থানে ৩।৪ অঙ্গুলি পুরু করিয়া মেলিয়া (বিছাইয়া)

দিতে হয়, এবং প্রত্যেক চারিদিন অন্তর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হয়, এইরূপ করিলে যখন হরিদ্রার রস মরিয়া যাইবে তখন হরিদ্রাগুলি ডলিতে (রগড়াইতে) হইবে। না ডলিলে উহার দানা গোল হইবে না, চেপ্টা হইয়া যাইবে। তিন চারি বার ডলিলেই দানা গোল হইবে। এক দিনেই যে তিন চারিবার ডলিতে হইবে এমন নহে। প্রথম দিন ডলিবার ২।৩ দিন পরে দ্বিতীয় বার ডলিতে হইবে। ডলিয়া দিবার পরও যতদিন ভাল করিয়া না শুকায়, ততদিন রৌদ্রে দিতে হইবে। ভাল করিয়া শুকাইলে ঐ হরিদ্রা কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া গোলাজাত কিম্বা বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হয়। মাঘ মাসের মধ্যেই হরিদ্রার সিদ্ধ কার্য্য শেষ করিতে হয়। হরিদ্রায় পোকা লাগিলে, তাহা গরুর চোনা মাখাইয়া শুকাইলে পোকা মরিয়া যায়। হরিদ্রা ভাল হইলে বিঘা প্রতি ২০/০ মণ শুষ্ক হরিদ্রা পাওয়া যায়। এক জমিতে দুই বারের অধিক হরিদ্রা রোপণ করা উচিত নহে, কারণ, উহাতে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট করিয়া দেয়। হরিদ্রা তুলিয়া সেই ক্ষেত্রে ভালরূপে সার না দিয়া অন্য ফসল দেওয়া উচিত নহে।

এক বিঘা জমিতে হলুদ লাগান খরচ—৩০৲ টাকা। আয় এক বিঘা জমিতে—১০০৲ টাকা।

পিপুল

"ক্ষেতের কোণা
বাণিজ্যের সোনা"

দীর্ঘকাল যাবৎ পরের গোলামি করিতে করিতে আমরা একেবারে মনুষ্যত্ব-হীন, উদ্যম-উৎসাহ-বিহীন, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আস্থা-যত্নশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। অধিক কথা বলিব কি, আমাদের এক্ষণে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের বাটীর চতুস্পার্শে যে সকল অত্যাবশ্যক, নিত্য প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষনোপযোগী ঔষধি, তরুলতা ইত্যাদি বিনা যত্নে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই জন্মিয়া ধরিত্রীর শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। ঐ যে বনে জঙ্গলে বাড়ীর চারিধারে, ছায়াযুক্ত স্থানে পিপুলের লতা জন্মে তাহার কি আমরা কোন খোঁজ খবর রাখি? যখন কাশি হয় তখন হয়ত ঐ লতা জাল দিয়া গোল মরিচসহ সেবনে আরাম বোধ করি, কিন্তু তাহার পর আর তাহার কোন খোঁজ খবর রাখি না। বঙ্গের নানা স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বন জঙ্গলে পিপুল লতা স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অযত্নে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া ক্রমাগত দুই তিন বৎসর সামান্য পরিমাণে ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। পতিত ফল গুলির

কোনপ্রকার সদ্ব্যবহার করা হয় না। বঙ্গের সর্ব্বত্রই পিপুল জন্মে। পাটের আবাদের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির আদর দিন দিন যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু উচ্চ ভূমিখণ্ডে ভালরূপ ধান্য বা পাট জন্মে না। উচ্চ ভূমিতে পিপুলের চাষ করিতে পারিলে, তাহাতে পাটের দ্বিগুণ আয় সম্ভাবনা, অথচ খাটুনি কম। বিশেষতঃ ইহাতে পাটের মত প্রতি বৎসরই সমভাবে খাটিতে হয় না। এক বৎসর খাটিলে ক্রমাগত তিন চারি বৎসর ফলভোগ করা যায়। কিন্তু উহা যে অনায়াস-লভ্য ও সমধিক লাভজনক একটী প্রধান কৃষিদ্রব্য, তাহা আমরা কখনও মনে করি না। যথারীতি আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় অন্যূন ২০০৲ টাকা নেট্ আয় হইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিকে আমাদের রুচি নাই। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! আমরা চিরদিনই ১৫৲ পনর টাকার কেরাণীগিরীর জন্য লালায়িত! বঙ্গীয় যুবকগণ যদি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রণালীতে পিপুলের চাষ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই আমাদের কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ও আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন।

পিপুলের গুণ ঃ—অগ্নিদীপ্তিকারক, বলকারক. রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মানাশক, লঘু ও রোচক।

১। জাতিভেদ—পিপুল দুই প্রকার। এক প্রকার সরু ও লম্বা এবং অন্য প্রকার অপেক্ষাকৃত মোটা ও বেঁটে।

এই শেষোক্ত জাতীয় লতাই রোপণ করিতে হয়। উভয় প্রকার পিপুলের পার্থক্য সাধারণ লোকে ফল দেখিয়া ভিন্নরূপ বুঝিতে পারে না। মোটা ও বেঁটে পিপুলই বাজারে বেণের দোকানে পাওয়া যায়; তাহারই চাষ করা কর্ত্তব্য। লম্বা জাতীয় পিপুলকে ঘোড়া পিপুল বলে; তাহা চাষ করিবার আবশ্যকতা নাই।

২। ক্ষেত্র নির্ব্বাচন—দোয়াঁশ উন্নত ভূমি, এমন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, পৌষ মাস হইতে ক্ষেত্রে এক ফুট গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। পিপুল বাগানের চারিধারে ১ বা ১॥০ ফুট নালা কাটিয়া জমি চিহ্নিত করতঃ তাহার উপর বেশ মজবুত করিয়া এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) কিম্বা চিতাগাছের বেড়া দিতে হইবে যেন ক্ষেত্রে গরু, বাছুর, ছাগল ইত্যাদি প্রবেশ করিতে না পারে। গাছ রোপণের পূর্ব্বে চারিবার জমি চাষ দিলেই চলিবে। প্রতি বিঘায় ৪০/০ মণ গোবর সার দিলে ফলন ভাল হয়।

৩। সময় নির্দ্ধারণ—পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চারি বা পাঁচবার জমি চাষ দিয়া বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে পিপুলের বীজ (অর্থাৎ গাঁটযুক্ত লতা) ৫।৬ গাছি একত্রে বাঁধিয়া প্রত্যেকটী ৪ হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু লতা রোপণের পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রে চারি হাত অন্তর সারি বাঁধিয়া ধঞ্চের গাছ লাগাইতে হয়, কারণ পিপুল-লতার সহিত ‘ধঞ্চে’ গাছের বড়ই প্রণয়।

কারণ উহার শীতল ছাওয়ায় পিপুল বেশ সতেজে জন্মিয়া থাকে এবং ঐ গাছ আশ্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণ ফল উৎপাদন করে। এ কারণ পিপুল চাষ করিবার পূর্ব্বে ধঞ্চের গাছ লাগান আবশ্যক। জমি প্রস্তুত হইলে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ জমিতে দীর্ঘে প্রস্থে সমান ৪ হাত অন্তর ছোট ছোট খানা করিয়া তাহার মধ্যে ৩।৪টী করিয়া ধঞ্চের বীজ পুঁতিয়া দিয়া তাহার উপর একটু একটু জল দিলে আপনা আপনি চারা জন্মিয়া থাকে; ঐ চারাগুলি ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হইলে অপেক্ষা কৃত সতেজ এক একটী চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। ইহার পরে চৈত্র মাসের শেষে লতা সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে সেই গুলিকে ১৬।১৭ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ৫।৬ গাছি লতা একত্র করতঃ আটি বাঁধিতে হয়। এইরূপ আঁটি বাঁধিবার সময় যাহাতে লতাস্থ গাঁটগুলি উল্টা পাল্টা হইয়া না যায় এবং তাহা বিপরীত ভাবে রোপিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আঁটিগুলিতে গোবর মাখাইয়া ধঞ্চে গাছের ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একহাত অন্তর সমানে সারি করিয়া ৪।৫ আঙ্গুল মাটির নীচে খাড়াভাবে পুঁতিয়া যাইতে হইবে। রোপণের পর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে গোড়ায় কিছু কিছু জল দেওয়া কর্ত্তব্য। আঁটি পুঁতিবার পর জল না পাইলে গাছ আঁওরাইয়া যায়, পরে বৃষ্টি পাইলে গজাইয়া

উঠে। নিম্নে অপেক্ষা কৃত উন্নত প্রণালীর চাষের বিষয় বিবৃত হইল।

লতা সংগ্রহ হইলে সেগুলি কিছুদিন একস্থানে জমা রাখিয়া তাহা হইতে বোঁটাশুদ্ধ পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, এবং তদ্দ্বারা ৮।৯ অঙ্গুলি ব্যাস বিশিষ্ট ছোট ছোট "বেড়ো" পাকাইয়া অথবা ৯।১০ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক হাত ব্যবধানে কিছু কিছু মাটি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে মধ্যে একটি বেড়ো এবং খণ্ডীকৃত ৩।৪ গাছি লতা দুই অঙ্গুলি মাটির নীচে পুঁতিয়া দিতে হয়। ঐ সকল বেড়োয় এবং লতায় ৫।৬টী করিয়া গাঁইট থাকা আবশ্যক। এইরূপভাবে লতা পুঁতিলে কিছুদিন পরে উহা হইতে সতেজ পিপুলের চারা জন্মিয়া থাকে, চারাগুলি কিছু বড় হইলে পরে বাগানের সমুদয় জমি অল্প খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং ইহার পর জমিতে ঘাস জন্মিলে তাহা নিড়াইয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতিত বিশেষ কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না।

চারাগুলি বড় হইয়া ক্রমে ক্রমে ধঞ্চে গাছ বাহিয়া উপরে উঠে এবং আষাঢ় মাসের শেষ হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল লতার মধ্যে "জাফরী" প্রস্তুত করিয়া দিলে লতা জাফরীর গা বাহিয়া অধিক ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয়। লতা ঘন হইলে নিস্তেজ লতাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়।

ধঞ্চে গাছগুলি ৩।৪ মাসের হইলে বাগানে ছায়া দানের উপযুক্ত হয়। আবার এদিকে পিপুলের লতা বড় হইতে ৪।৫ মাস সময় লাগে। দ্বিতীয় বৎসর হইতে পিপুল চাষে লাভ আরম্ভ হয়। যত্ন করিয়া রাখিলে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পিপুলের বাগান রাখা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে লতা পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। ফল তুলিবার পর লতার গোড়া কাটিয়া দিলেই সেই গোড়া হইতে আপনা আপনি নূতন লতা গজাইয়া উঠে। ক্রমে বাগানের ধঞ্চে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া গেলে নূতন গাছ লাগাইয়া পূরাতন গাছগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। ৪।৫ বৎসরে ধঞ্চে গাছ বুড়া হইয়া যায়। তখন তাহাতে বাগানে ছায়া-দানের উপযুক্ত পাতা জন্মে না। আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত লতায় পিপুল ধরে এবং পৌষ মাসের প্রথমে পাকিতে আরম্ভ হয়। এক সঙ্গে সমস্ত পিপুল পরিপক্ক হয় না অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পাকিতে থাকে। অতএব একদিন বা এক সময়ে সমস্ত পিপুল উঠাইতে হয় না, ক্রমশঃ তুলিতে হয়।

পিপুল তুলিবার সময় টান লাগিয়া যাহাতে লতা ছিঁড়িয়া না যায়, এইরূপ সাবধান হইতে হইবে। পিপুল পাকিতে আরম্ভ হইলে তাহার মধ্যে "বীরপাক" অর্থাৎ সুপক্ক পিপুলগুলি তুলিয়া তাহা রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইতে হয়। ১০।১২ দিনেই উহা শুকাইয়া যায়। অপক্ক পিপুল শুষ্ক করিলে চিমসে হইয়া যায় এবং দানা বাধে না। শুষ্ক

পিপুল কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া বস্তাবন্দী করিয়া রাখা উচিত। পিপুল নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কলিকাতার বাজারে ইহা অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এমন কি কোন কোন সময়ে ১০০৲ একশত টাকা করিয়া মণ বিক্রয়হয়। অত্যন্ত সুলভ মূল্যে রিক্রয় হইলেও ৮০৲ টাকা মণের কম কখনও বিক্রয় হয় না। রীতিমত বাগান করিয়া চাষ করিলে বিঘা প্রতি ৫/০ মন পিপুল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিপুলের জমি=দোয়াঁশ উন্নত (জল না উঠে)

পিপুলের সার=নাইট্রোজেন বিঘাপ্রতি ৪৮ পাঃ।

পটাস্...১৬ পাঃ।

ফস্ফরিক এসিড...১৪ পাঃ

বিঘা প্রতি চাষের খরচ ৫০৲

বিঘা প্রতি আয় ৫/ মণ হইলেও অন্যূন ৫০০৲।

এক বৎসর লাগালে ১০ বৎসর চলিবে কেবল মাত্র বেড়া বদল ও ধঞ্চে ফুলের গাছ বদল করিয়া দিতে হয়। গাছ লাগাইলে আর সারের দরকার হয় না। কারণ উহারা সূর্য্য কিরণ হইতে সার (নাইট্রোজেন) সংগ্রহ করিয়া লতাকে খাওয়ায়।

গোল মরিচ

—— ০ ——

ইতিবৃত্ত :—ভারতবর্ষ গোলমরিচের আদি জন্মস্থান। অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতের নানাস্থানে অল্লাধিক পরিমাণে চাষ হইতেছিল। এক সময়ে মাদ্রাজের অন্তর্গতঃ মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে চাষ হইত এবং মালাবার প্রদেশ একমাত্র গোল মরিচের জন্য সমগ্র জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের রংপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে অত্যল্প পরিমাণে চাষ প্রচলিত ছিল। আসামে কতিপয় স্থানে সামান্য পরিমাণে চাষ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে পিপুল লতার ন্যায় গোল মরিচের লতা স্বতঃই জন্মিয়া জংলা হইয়া গিয়াছে কাহারো ব্যবহারে লাগে না। ত্রিপুরা জেলায় সামান্য পরিমাণে জন্মে। বর্ত্তমান সময়ে ভারত অপেক্ষা ভারত সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জেই প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ উৎপন্ন হইতেছে। সুমাত্রা বোর্ণিও ও জাভা প্রভৃতি দ্বীপেই বিস্তৃত ভাবে চাষ হইতেছে। মালাবারের মরিচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুমাত্রার মরিচ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। আসাম প্রদেশে যে মরিচ জন্মে তাহাও উৎকৃষ্ট নহে।

১। নাম :—বাংলা গোলমরিচ, সংস্কৃত নাম উষণ বোল, বর্ণ্ণীজ সবনেট, বেন্নুজ, কটূক ও বৃত্তফল। হিন্দি

নাম মিরি ও কানমিরি, মহারাষ্ট্র ভাষায় মরিচ, ইংরেজীতে piper nigrum বলে।

২। গুণ ও ব্যবহার ঃ—কাঁচা গোলমরিচ স্বাদু, গুরুপাক শ্লেষ্মানাশক। শুষ্ক মরিচ—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ্মগুণ বিশিষ্ট, কটুরস্ উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক ও শূলনাশক। কবিরাজগণ বলেন ইহা জার্ণকারক, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং পক্ষাঘাত রোগে উপকারী। সর্ব্বপ্রকার সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসায় ইহা উত্তেজক রূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া, মস্তিষ্কের সর্দ্দি, তালুদেশের ঘা এবং কলেরা রোগেও গোল মরিচের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ইহা চক্ষু রোগেরও ঔষধ। গোল মরিচ যে কেবল রসনার তৃপ্তিজনক তাহা নহে। ইহা নানা প্রকার কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। জব্বলপুরের সুবিখ্যাত ডাক্তার চামুন লালের মতে গোলমরিচ উত্তপ্ত জলে ভিজাইয়া সেই জল ব্যবহার করিলে গনোরিয়া, শূল বেদনা এবং কলেরা নিবারিত হয়!

ডাক্তার ডি, আর সমসন্ বলেন ঃ—উগ্রশক্তি বিশিষ্ট (strong decoction) মরিচের ক্বাথ সেবন করিলে, কলেরা রোগে বমন, রেচন, উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ দূর হয়।

(খ) কলম্বা ও বিস্মাথের সহিত অথবা হিং ও কর্পূরের সহিত গোলমরিচ ব্যবহার করিলে ডিস্পেসিয়া আরোগ্য হয়।

(গ) মরিচে এক প্রকার মেদযুক্ত তৈল (fatty oil)

এবং এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল (essential oil) আছে, মেদযুক্ত তৈলের জন্য মরিচে কটু আস্বাদ হইয়াছে। উদ্বায়ী তৈল উহার উগ্রগন্ধের একমাত্র কারণ।

৩। জমি নির্ব্বাচন ঃ—

দোয়াঁশ মাটি গোলমরিচ চাষের পক্ষে প্রশস্ত। রসাল দোয়াঁশ জমি যাহা খুব উঁচু ও শুষ্ক নহে, এইরূপ জমিতেই গোলমরিচ চাষ করিতে হয়। ইহা আরোহী লতা, পিঁপুলের ও পানের ন্যায় আশ্রয় করিয়া লতা বর্দ্ধিত হয়। কতকটা ছায়াযুক্ত স্থান-ই উত্তম। একারণ জয়ন্তী ও পাটকেন মান্দারের বাগানেই ইহার চাষ প্রশস্ত।

৪। রোপণ প্রণালী ঃ—

পানও পিপুলের ন্যায় লতাকলম করিয়া রোপণ করিতে হয়। লতা কলম অতি সহজ। (একটি গোল মরিচের লতা প্রায় একহস্ত পরিমিত খণ্ডিত করিয়া, তাহা সরস মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে, তাহাতে শিকড় জন্মে। কর্ত্তিত অংশ মৃত্তিকায় না পুতিয়া, সারযুক্ত মৃত্তিকা গাটের চতুস্পার্শ্ব দিয়া মুঠের ন্যায় করিতে হয়) ফাল্গুণ মাসে জমি চাষ করিয়া ১০ হাত অন্তর একটি করিয়া পাটকেন মান্দারের কচা পুতিয়া দিতে হয়; পরে আষাঢ় মাসে এই কচার দুই ধারে দুইটি করিয়া মরিচের লতা বসাইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক ৩ মাস অন্তর গাছের

গোড়া কোপাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতে হয়। ঐ পাটকেন মান্দার শীম্বী জাতীয় গাছ বলিয়া সূর্য্যকিরণ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ঐ লতাকে খাওয়াইবে একারণ অন্য সারের প্রয়োজন নাই। ঐ লতাগুলি ধীরে ধীরে ঐ গাছের গাত্রোপরি ২০ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ফল অর্থাৎ মরিচ দান করিবে। এক বিঘা জমিতে ১০ হাত অন্তর আশ্রয় গাছ লাগাইলে ১০টি লাইন হইবে অর্থাৎ ১০ X ১০= এক শতটী মান্দারের বা জয়ন্তী ফুলের গাছ লাগাইতে হইবে এবং আষাঢ় মাসে প্রতি গাছে ২টী করিয়া মরিচের লতা উঠাইয়া দিতে হইবে অর্থাৎ ২০০টী চারা লাগাইতে হইবে।

৫। সার—নাইট্রোজেন ও সোরাজান এবং ফসফেট ইহার প্রধান সার। নাইট্রোজেনে লতার উপকার হয়। ফষ্ফেটযুক্ত সারে ফলণ বেশী হয় ও ফল ওজনে ভারী হয়। গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা, চোনা ও পচা গোবর উৎকৃষ্ট সার। এক বিঘা জমীতে কুড়ি মণ গোবর দিয়া ফাল্গুন মাসে চাষ করিয়া ধঞ্চে, অড়হর বুনাইয়া দিবে এবং ১০ হাত অন্তর পাটকেন মান্দারের গাছ লাগাইবে। ধঞ্চে ও অড়হরের গাছ এক হাত উচু হইলে বৈশাখ মাসে ঐ জমিতে মিশাইয়া দিবে কেবল মান্দারের গাছ রাখিয়া দিবে প্রতি বৎসরের ফাল্গুন মাসে এই প্রকারে সার দিবে। একবার লতা লাগাইলে ২০ বৎসর চলিবে।

৬। তদ্বির—৩ তিন মাস অন্তর লতার গোড়া কোপাইয়া

দেওয়া ; পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সপ্তাহে লতার গোড়ায় একদিন করিয়া জল দেওয়া। তৃতীয় বৎসর হইতে ফল ধরিলে চৈত্র মাসে পাকা ফল তোলা, মরিচের থলো কাটা।

৭। ফল সংগ্রহ—শরৎ কালে এই লতা পুষ্পিত হয়, এবং বসন্ত সমাগমে পক্ক ফল প্রদান করিয়া থাকে। ফল সুপক্ক হইবার পূর্ব্বে সংগ্রহ করা উচিৎ, কারণ ফল পাকিলে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। গুণাংশে সুপক্ক ফল নিকৃষ্ট হয়, বেশী পাকিলে ঝাল কমিয়া যায়। ফলগুচ্ছের সবুজ বর্ণ বৃন্তগুলি লাল বর্ণে পরিণত হইতে আরম্ভ করিলেই ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ফল গুলি লতা হইতে সংগ্রহ করিয়া ৩ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়, তৎপর একখানি পরিষ্কার তক্তার উপর আছাড় দিলেই, বৃন্ত হইতে ফলগুলি ঝড়িয়া পড়িবে ; শস্যাদি মাড়াই করার ন্যায় মাড়াই করিয়া লইলেও হয়। ফলগুলি পরে ভাল করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িয়া বস্তাবন্দি করিয়া বিক্রয় করিবে।

৮। বিঘাপ্রতি আয়—এক বিঘায় ২০০ শত লতায় গড়ে /২ সের করিয়া শুষ্ক মরিচ পাওয়া যাইবে ২০০×২=৪০০ সের অন্যূন ১০ মণ গড়ে, ২০৲ টাকা মণ হইলেও ২০০৲ টাকা আয় হইবে। প্রতি বৎসরে ফাল্গুন মাসে কোপাইয়া ধঞ্চে দেওয়া ব্যয় ৩৲ টাকা, খাজনা বিঘা প্রতি ২৲ টাকা, জল ইত্যাদি দেওয়া ৫৲ টাকা, বীজলতার

দাম (২০৲ টাকা) কিন্তু ২০ বৎসর চলিবে। বন জঙ্গল পরিপূর্ণ এনোফিলিস্ মশা তাড়াইয়া যুবকগণ এই সকল লাভ জনক চাষ করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতি করুন।

পান চাষ

সংস্কৃত তাম্বূলম্ হইতে পনম্, পান ইতি ভাষা। অস্য গুণাঃ কটুত্বম, তিক্তত্বম্, উষ্ণত্বম্, মধুরত্বম্, ক্ষারত্বম্, কষায়ত্বম্। বাত, কৃমি কফ, দুঃখদোষ-নাশিত্বম্। কামাগ্নি-সন্দীপণত্বম্। স্ত্রীসম্ভাষণ-ভূষণত্বম্ ইত্যাদি (রাজবল্লভ)।

আয়ূর্ব্বেদেও পানের অপরিসীম গুণ দৃষ্ট হয়। অনেক রোগে কবিরাজ মহাশয়েরা অনুপানে রস ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। হিন্দুর দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে বহু পর্ব্ব ও ধর্ম্ম-কার্য্যে পানের প্রভূত ব্যবহার আছে। মুসলমানেরা পান ও আতর দিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। আহারের পর তাম্বূল ব্যবহার করেন না, এরূপ লোক, কি হিন্দু কি মুসলমান, সব সমাজেই অতি বিরল।

১। **পানের গুণ**—রুচিকারক, স্মারক, মুখদোষনাশক, বলকারক, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক। অধিক মাত্রায় পান খাইলে শরীরস্থ ত্রিদোষ কুপিত হয়। পরিপাক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং বলের হ্রাস হয়। রক্তপিত্ত-রোগী যাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠে তাহার পান খাওয়া উচিত নহে। পানের ডগা, শির ও বোঁটা বাদ দিয়া পান খাওয়া উচিত। পচা ঘায়ে পান বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষত শীঘ্র পুরিয়া উঠে ও বাড়িতে পারে না। পানের রস রাতকানা লোকের চক্ষে দিলে রাত-

কাণা ভাল হয়। আমাদের দেশে আহারের পর যোয়ান, লবঙ্গ ইত্যাদি মসলা সহযোগে পান খাওয়ার প্রথা আছে, তাহা হজমশক্তির সাহায্য ও মুখের বিরসতা নাশ করিবার পক্ষে সুন্দর ব্যবস্থা।

২। **জাতিভেদ**—পানের নানা জাতি আছে, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আকৃতি, স্বাদ ও পত্রে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কলিকাতার বাজারে, মিঠাপান, ছাচিপান, দেশী পান ও কর্পূরীপান দেখিতে পাই। দেশীপান আবার রংপুরী, যশুরে ও বারুইপুরী নামে জন্ম-স্থানানুযায়ী পরিচিত। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার পান আমরা দেখিতে পাই, উহা বাড়ীর পাচিল বা আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি গাছে আরোহী লতারূপে আশ্রয় করিয়া থাকে উহাকে গাছ পান বলে। বারুজীবীরা বরোজে ইহার আবাদ করে না।

(ক) মিঠাপান—ক্ষেত্রজ রং একটু ফর্সা এবং শ্বেত আভাযুক্ত, সুস্বাদু এবং লালাবর্দ্ধক। ইহার একটী সুগন্ধ আছে, পাতা একটু পুরু, চর্ব্বনে মুখ সরস হইয়া থাকে। মিঠা পানই পানের রাজা মূল্যও অধিক। ইহার জন্মস্থান মেদিনীপুর এবং বিহার ও যুক্ত প্রদেশ।

(খ) ছাঁচিপান—ইহাও চর্ব্বনে উত্তম সুগন্ধ অনুভব হয়। আকারে ও বর্ণে সাধারণ পানের ন্যায়, পার্থক্যের মধ্যে পত্রের নিম্নে সূক্ষ্ম কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা বা শিরা দৃষ্ট

হয়। ইহাতে মুখের সরসতা বর্দ্ধিত করে কিন্তু চর্ব্বনে ওষ্ঠের রঞ্জরাগ বর্দ্ধিত হয় না।

(গ) কর্পূরীপান—দেখিতে, আকারে, বর্ণে মিঠা পানের ন্যায়, কেবল কর্পূরের গন্ধবিশিষ্ট। ইহার জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশ।

(ঘ) দেশীপান—উল্লিখিত ত্রিবিধ পান ব্যতীত বাজারে আমরা যে পান দেখি তাহাদের নাম দেশীপান। কেবল কয়েক প্রকার সামান্য বিশেষত্ব লইয়া ইহার মধ্য হইতে রংপুরী, যশুরে বারুইপুরী ইত্যাদি নামে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এবং উহাদিগকে সেই বিশিষ্টতার জন্য পৃথক্ জাতীয় বলা হয়। ইহারা সকলেই বরোজে জন্মে। সাধারণ দেশীপান হইতে রংপুরী পানের পার্থক্য এই যে, ইহা ক্ষুদ্রাকার এবং পাতা পুরু; সহজে খিলি করা যায় না। যশুরে পান বৃহদাকার, পাতলা পাতা এবং বর্ণে কৃষ্ণাভাযুক্ত। বারুইপুরের পানের বিশিষ্টতা আকারে বা বর্ণে ধরা যায় না। পাতাগুলি অল্প পুরু অথচ কোমল, বেশ খিলি করা যায় এবং চর্ব্বনের পর আদৌ ছিবড়া থাকে না। অন্য দেশীপানে ছিবড়া থাকে। ওষ্ঠ রাগ বর্দ্ধন ও মুখ সরস করাই দেশী পানের বিশিষ্টতা। পান মাত্রই সুখী লতা, ইহারা বেশী রৌদ্র, ঝড় ও বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই বরোজে ইহারা বর্দ্ধিত হয়।

(ঙ) গাছপান—গাছ পানের পাতাও পুরু মচ্‌মচে

এবং ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া ভাল খিলি হয় না। ইহার বল্লরী আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বড় গাছ বা ইষ্টক প্রাচীরের পার্শ্বে রোপণ ফরিতে হয়। বৃক্ষ বা প্রাচীরের মূল হইতে ২ ২॥০ হাত দূরে এক হাত গভীর খাত করিয়া পৌষ ও মাঘ মাসে ছাই এবং গোবর সার দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং পরে বর্ষার সময় চারা সংগ্রহ করিয়া ঐ খাতে এক পোয়া সরিষার খৈল দিয়া রোপণ করিবে। যদি বৃষ্টি বন্ধ থাকে, তবে কয়েক দিন মূলে জল দিবে। ইহার "ডগা" বসাইলে গাছ হয়। পুরাতন মূল হইতেও স্বাভাবিক চারা পাওয়া যায়, এই চারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ডগা বা চারা বসাইয়া তাহার মূলে জল দিয়া মৃত্তিকার রন্ধ্র বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন চারার গোড়া শুষ্ক না হয়; এই-রূপে দুই তিন সপ্তাহ অতীত হইলে, নূতন শিকড় ছাড়িয়া বর্দ্ধিত হইয়া যখন গাছের নূতন পাতা ছাড়িয়া গাছ লতাইয়া যাইবে সেই সময়ে চারি পাঁচখানি কঞ্চি একত্রে বাঁধিয়া চারার মূল দেশ হইতে অবলম্বন বৃক্ষ বা প্রাচীরের গাত্রে হেলাইয়া রাখিয়া অতি কোমল ধীর হস্তে লতাটি কঞ্চির আটির গাত্রে রাখিয়া তৃণ বা পাটের দ্বারা খুব আলগা করিয়া আটি সহ বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ বাঁধিয়া দেওয়ার কারণ এই যে লতাটা যেন মাটিতে পড়িয়া না যায়। পরে ঐ কঞ্চির সাহায্যে লতা ক্রমে স্বীয় আশ্রয় তরু অবলম্বন করিয়া ইন্দুরের নখের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম শিকড় বাহির করিয়া গাছেব

ত্বক্ জড়াইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। গাছের উপর উঠিয়া লতা বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ পাতায় পূর্ণ হইয়া যায়, এই পাতার নামই পর্ণ বা পান। আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি গাছের উপরে গিয়া পান ধরে বলিয়া লতা যে একেবারে পান শূন্য হয় তাহা নহে। পান তুলিবার সময় এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন লতাই যেন একেবারে পত্র শূন্য না হয়। বিশেষতঃ লতার অগ্রভাগের কচি কচি পাতাগুলি রাখিয়া দিতে হইবে। মূল ও মধ্যদেশে যে সুপক্ক পাতা পাওয়া যাইবে তাহাই ভাল পান। গাছ একবার লাগিয়া গেলে উহার পালন ও পোষণ জন্য যে কোনও তদ্বির নাই তাহা নহে। ফলে যতকাল লতা জীবিত থাকিবে, ততদিন বর্ষে বর্ষে গোড়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে জলসেচন এবং বর্ষার প্রারম্ভে সার প্রদান কর্ত্তব্য। বৃক্ষের নিম্নস্থ পানের লতার শীতকালেও প্রভূত জলের দরকার হয়। পান গাছের গোড়া ভিজা থাকা প্রয়োজন! লতা যত দীর্ঘজীবী হইবে পানও তত বেশী এবং ভাল হইবে। আমি ২০ বৎসরের একটী পান-লতা দেখিয়াছি সেই একটী গাছেই সেই গৃহস্থের পানের কার্য্য চলিত। এই গাছ পানের আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে ইহারা আশ্রয়দাতা তরুর কোনও অপকার করে না। কেবল আশ্রয় মাত্র গ্রহণ করে এবং বৃক্ষ শাখার উপর নির্লিপ্ত ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। একারণ আশ্রয়দাতা বৃক্ষের পল্লব, ফুল ও

ফলের কোন ক্ষতি করে না। কেবলমাত্র লতার গ্রন্থিসম্ভূত শিকড় সকল বৃক্ষ-কাণ্ডের পরিত্যক্ত প্রায় জীর্ণ শীর্ণ ত্বক্‌সন্ধি এরূপে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, বায়ুভরে চালিত বা অন্য-প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও সহসা স্থানচ্যুত হয় না।

৩। **ক্ষেত্র নির্ব্বাচন**—কালো রংএর দোঁয়াশ মাটি পান চাষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমি। পানের জমি উচ্চ হওয়া আবশ্যক যেন জল দাঁড়াইতে না পারে। কিছু লাল রংএর বালু-দোঁয়াশ জমিতে মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ মিঠা পান জন্মিয়া থাকে। পানের জমি সর্ব্বদা সরস থাকা প্রয়োজন। অমিশ্র কোমল মাটি পানের বিশেষ উপকারী এইজন্য কেহ কেহ পাক্ মাটি প্রভূত পরিমাণ দিয়া থাকেন।

৪। **সময় নিরূপণ**—ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসে পান রোপণ করা যায়, একারণ কার্ত্তিক ও মাঘ মাস হইতে অর্থাৎ ৫।৬ মাস পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র 'পতন' বা জমির পারিপাট্য সাধনের কার্য্য করিতে হয়। মাটিতে খোলা, ইট, কঙ্কর, তৃণ, মূল ইত্যাদি কিছুই থাকিতে দিবে না।

৫। **বীজ বা চারা প্রস্তুত করণ**—পানের "ল" বা "ডগা" হইতে চারা উৎপন্ন হয়, ইহা আর কিছু নয়। বর্ষার জল পাইয়া পান গাছের গ্রন্থি সমুহ হইতে যে পান বা শাখা বহির্গত হয় তাহার নাম "ল" বা "ডগা"। বারুজীবের চারা সংগ্রহের ইচ্ছা না থাকিলে ঐগুলি নষ্ট করিয়া দেয় কারণ ঐগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পানের পাতা ছোট হইতে

থাকে। নূতন বরোজ করিবার প্রয়োজন হইলে ঐ 'ল' বা 'ডগা' মাটি চাপা দিয়া চারা করিয়া লওয়া হয়। আবার অনেকে পুরাতন গাছ (মূল লতা) খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিয়াও চারা তৈয়ার করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঐ খণ্ডগুলিকে মাটিতে পাতিয়া তদুপরি অল্প অল্প মাটি দিয়া চারা বাহির করিয়া লইয়া থাকেন এই চারাকে (খাসি চারা) বলে—ইহাই উৎকৃষ্ট চারা।

৬। **রোপণ প্রণালী**—পান ক্ষেত্র বা বরোজের উপরিভাগ হইতে চাড়া, কঙ্কর, তৃণ, মূল ইত্যাদি দূর করিবার জন্য আবশ্যকতা অনুসারে ২।১ ফুট মাটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ৪ ফিট্ অন্তর পিলি বা সারি করিয়া প্রত্যেক পিলিকে অন্ততঃ ৬।৭ ইঞ্চি প্রসার করিবে এবং উহার মধ্যস্থিত মাটি ধূলির মত করিতে হইবে। এই সময়ে বিঘা প্রতি ১০/মণ সরিষার খৈল দিলে উত্তম হয়; কিন্তু আমি পুষা পরীক্ষা ক্ষেত্রে ৫/মণ পাক মাটি চূর্ণ ও ৫/মণ রেড়ির খৈল দিয়াছিলাম এই পিলির ভিতর সুস্থ ও সবল তেজী চারা লাগাইতে হইবে। প্রতি ৬।৭ ইঞ্চি অন্তর দুইটী করিয়া চারা পিলির দক্ষিণে ও বামে বসাইতে হইবে। এইরূপ শৃঙ্খলানুযায়ী পান বসান হইয়া থাকে। চারার গোড়া বেশ করিয়া চাপিয়া মাটি দিবে গোড়ায় যেন ছিদ্র না থাকে। তারপর জল দিয়া মূলদেশে বায়ু প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। আষাঢ় মাসের রোপিত চারায় বৃষ্টির জল পায় বলিয়া অনেকটা

শ্রমের লাঘব হয় কিন্তু তাহাতে পান ভাঙ্গিবার জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। আর ফাল্গুন মাসের রোপিত চারাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জল সেচন করিতে পারিলে আষাঢ় মাসেই পান তুলিবার সময় হয়। এই পানকে নূতন পান বলে।

৭। **বরোজ**—পানের ক্ষেত্র ঘেরা এবং আচ্ছাদন যুক্ত হয় বলিয়া উহাদের নাম বরোজ। প্রবল ঝড়ের এবং রৌদ্রের প্রভাব হইতে গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। চতুর্দ্দিকের ঘেরা বা বেড়া শক্ত হওয়া উচিত, নতুবা গরু, ছাগল ইত্যাদি হইতে রক্ষা করা অসম্ভব। সাধারণ বেড়ার মত বরোজের বেড়া হয় না, প্রবল বায়ু রোধ এই বেড়ার উদ্দেশ্য, এ কারণ বেড়া ঘন হওয়া উচিত সাধারণতঃ সুপারির 'ব্যেগো', খেজুরের পাতা, তালপাতা, নল, পাটকাটি, কঞ্চি ইত্যাদিতে বেড়া হয়, এবং প্রতি এক ফুঠ অন্তর শক্ত বংশখণ্ড অন্য কোন সরল কাঠ (গরাণ, ছিটে, ধঞ্চে) বা লৌহদণ্ডের আশ্রয়ে বেড়াকে শক্ত করা হয়। উপরে ছায়ামণ্ডপ বা বিতান নির্ম্মাণ করা হয়। তজ্জন্য বেড়ার শক্ত খুটার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লম্বা লম্বা বাখারী এপার ওপার করিয়া সাজাইবে। প্রত্যেক বল্লরী বা পান গাছের মূলের কাছে ত্রিপদার ন্যায় বাখারী বা গরাণ ছিট্ আশ্রয়দণ্ডরূপে প্রোথিত করিবে। এইগুলি গাছের এবং বিতানের বা ছাউনীর উভয়ের আশ্রয় হইবে। ঐ

ত্রিপদীগুলির মধ্যে প্রত্যেক বল্লরীর জন্য সরু সরু কঞ্চি বা পাটকাঠি নির্ম্মিত দণ্ড পৃথক্ পৃথক্ আশ্রয় থাকিবে। নল খড়ি ইত্যাদি গুল্মদ্বারা যেমন বেড়া বেষ্টন করা হয় তেমনি লম্বা বাখারী পূর্ব্ব কথিত পাড় উপরে সাজাইয়াবাঁশের চটা ঘন ঘন বাঁধিয়া তদুপরি কেশে বা উলুখড় পাতলা করিয়া বিছাইয়া ছাউনি করিবে। এমন ভাবে বিছাইবে যেন মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়া অল্প রৌদ্র ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। বলা বাহুল্য এই ছাউনি সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হওয়া দরকার, নতুবা বাতাসে উড়িয়া যাইবে। ছাউনি ক্ষেত্র হইতে এত উচ্চ হওয়া দরকার যেন উহার মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত চ'লে অর্থাৎ ৫ হাতের কম না হয়; অনুচ্চ হইলে যাতায়াতের অসুবিধা এবং লতার উত্তমরূপ বর্দ্ধিত করিবার পথে বাধা প্রদান করাও হয়, সুতরাং বিতান একটু উচ্চ হওয়াই আবশ্যক। মঞ্চ নিম্ন হইলে কোনমতে কার্য্য চলিবে না। তাহাতে প্রথম বাধা ক্ষেত্রপালের যাতায়াত; দ্বিতীয় বাধা লতা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতে না হইতে তাহার পরিবর্ত্তনে বাধা পড়িবে কারণ অপর লতার ন্যায় পানের লতাকে স্বেচ্ছানুরূপ ও স্বাভাবিক রূপে বিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। লতা-টিকে উর্দ্ধভাগের মঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়িতে দিবে উহার অগ্রভাগ মঞ্চ স্পর্শ করিলেই লতার আগায় বিবেচনা মত পাতা রাখিয়া উহার মূল ও মধ্যদেশ হইতে পাতা ভাঙ্গিবে। ধীরও কোমল হস্তে নিষ্পত্র লতাটিকে তাহার আশ্রয় দণ্ড হইতে নিম্নে

পাতিত করিয়া দাঁড়া বা আইলের উপর পাশাপাশি ভাবে গোল চক্রাকারে সর্পকুণ্ডলীর ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সাজাইয়া রাখিবে ও বিস্তৃত পরিমাণ অথবা তাহার অধিক লতার সর্ব্বাগ্রভাগ পত্রপুঞ্জসহ অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বস্থাপিত পুরাতন বা আবশ্যক হইলে নূতন দণ্ড স্থাপন করিয়া ঐ দণ্ডগাত্রে লতার অগ্রভাগ সংযোজিত ও সংবদ্ধ করিয়া দণ্ডের মূলদেশে ও সন্নিকটে মৃত্তিকার উপর লতার যে অংশ সরল ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিবে; তদুপরি পুনরায় বিশুদ্ধ দোয়াশ মৃত্তিকা চূর্ণ সরিষার খৈল সহযোগে স্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্তে সজোরে চাপিয়া জল সেচন দ্বারা মাটির ছেঁদা (রন্ধ্র) বন্ধ করিয়া দিবে। লতা ও পত্রে অল্প অল্প জলের ছিটা দিবে। লতা মূলে আলগা মাটির উপর জল সেচন কালে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে মাটি ধুইয়া লতার বাহিরে না পড়ে। জলের পতন বেগে মাটির চাপ ভাসিয়া কিছু মাত্র মাটি সরিয়া না যায়। এইরূপে যথাক্রমে লতাটি স্থাপিত হইলে ঐ নূতন প্রদত্ত মৃত্তিকা-মধ্যে শিকড় বাহির করিয়া, গাছ পুনরায় নূতনত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদিও নূতন চারা বসানর ন্যায় সমুদয় পাইটই পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, কিন্তু লতার অগ্রভাগকে পুরাতন লতা হইতে কর্ত্তন বা বিচ্ছিন্ন করিবে না। বিচ্ছিন্ন করিলে চারা বাঁচিতে পারে বটে কিন্তু নূতন বরোজের ন্যায় ঐ চারা সতেজ হইতে বহু বিলম্ব ঘটে। লতা কুণ্ডলীকরণ কার্য্য,

বৎসরে দুইবার অর্থাৎ আষাঢ় ও ফাল্গুন মাসে করিতে হইবে। ইহাতে ক্ষেত্রস্বামীর অর্থাগমের ক্ষতি বা সঙ্কোচ ঘটে না, কারণ যখন বরোজের এক অংশের পাইট চলিতে থাকে তখন অপর অংশের পত্র চয়ন সম্পূর্ণ চলিবে। বরোজে লাঙ্গলের কার্য্য অসম্ভব ও অনাবশ্যক। বারুইকে সকল সময়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুবুদ্ধির সহিত বরোজ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে নিরত থাকিতে হইবে যে কোন স্থানে একটী মাত্রও তৃণ অঙ্কুরিত হইতে না পারে। অধিকন্তু পান তোলা, লতামূলে জল সেচন, বায়ূ-তাড়িত ভূপতিত লতার উদ্ধার ও তাহাকে যথাস্থানে স্থাপন, চূর্ণ খৈল নিক্ষেপ, চারার মূল শিথিল ও মৃত্তিকার অভাব হইলে তাহার পূরণ, অপ্রয়োজনীয় নূতন চারা গজাইলে তাহার সংহার, খোলা, ইষ্টক, কঙ্কর, অস্থি, কাষ্ঠখণ্ড ক্ষেত্র হইতে অপসারণ তাহার নিত্য কার্য্য। সময়ে সময়ে নিড়ানি দ্বারা চারার মূলদেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া শিথিল করিয়া দেওয়াও প্রয়োজনীয় কার্য্য। উপরি উক্তরূপে সযত্নে সার প্রদান ও পাইট রাখিতে পারিলে একটি বরোজ ত্রিশ বৎসর স্থায়ী হইতে পারে। ১ম বৎসরের পর হইতে ক্রমান্বয়ে আয় বাড়িতে থাকে। পানের বরোজের স্থান বিশেষে চই, চুপড়ি আলু, শাক আলু পুই ডাঁটা, ওল, মানকচু, উচ্ছে, পটল, ও সুপারি বৃক্ষ চারিধারে রোপিত হইয়া থাকে ইহার দ্বারাই জমির খাজনা অনেক স্থানে শোধ যায়। এইরূপ কৃষিতে বরোজের কোন অনিষ্ট হয় না।

৮। **সার কথন**—বাঙ্গালাদেশের বারুজীবীরা কেবল মাত্র সরিষার খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রথমবর্ষে বিঘা-প্রতি ৪মণ, পরে বাড়াইতে বাড়াইতে বিঘাপ্রতি ৪০ মণ খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু যদি বিঘাপ্রতি ৪/মণ বোদ মাটি অর্থাৎ পাক্ মাটি শুকাইয়া চূর্ণ করতঃ ব্যবহার করেন তবে বিঘা প্রতি ৫/মণ সরিষার খৈল হইলেই যথেষ্ট হইবে। কৃষি বিজ্ঞানে আমরা বিঘাপ্রতি ৫/মণ খৈল, ৪/মণ পাক্মাটি, ১/ মণ ঘুঁটে চূর্ণ এবং অর্দ্ধমণ সোরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিয়া বিবেচনা করি। যে যে স্থানে পোকার উপদ্রব আছে বা পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না আমি সেই সেই স্থানে একপ্রকার মিশ্র সার প্রদানে বিশেষ ফল পাইয়া ঐ সার বিটিলটোন নামে রেজিষ্টারী করিয়াছি এক বিঘা জমিতে ২০ টাকা মূল্যের ঐ সারপ্রদানে বহু পান হয় ও কোনরূপ পোকা ধরে না।

৯। **তদ্বির**—অন্যান্য কৃষির ন্যায় পান-চাষেও যথেষ্ট বাধা বিঘ্ন আছে। পান-লতা গ্রীষ্মকালে অধিক রৌদ্রের জন্য খরায়, বর্ষাকালে বেশী জল বসিলে মরিয়া যায়, তৃণভোজী গো মেষ, ছাগাদি পশুতেও অনিষ্ট সাধন করে, শৃগাল কুক্কুর বরোজ মধ্যে প্রবেশ করিলে লতা ছিন্ন ও পত্র ভঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন করে। সজারু, কাঠবিড়াল, লাফা ও ইন্দুর পানের ক্ষতি করে। আর উচ্চিংড়ে, ঘুরঘুরে, সময়ে সময়ে পঙ্গপালও ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এই সকল প্রতিকারের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

আর পানে ‘ধসা’ লাগা এবং নানাবিধ পোকা সর্ব্বদাই দেখা যায়। বিশেষতঃ গত ৫ বৎসর হইতে সমগ্র বাংলায় এক প্রকার পোকা লাগিয়া পানের বংশ নির্ব্বংশ করিতেছে। ধসা লাগা বা যে কোন প্রকারের পোকাই হউক না কেন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঘুঁটের ধূয়া দিতে পারিলে পোকা লাগা নিবারিত হয় এবং ঘুঁটের আগুনের উপর একটী পাত্র বসাইয়া উহাতে দুই এক ছটাক গন্ধক রাখিয়া দিলে উহা গলিয়া ধূয়ার সহিত মিশিয়া বরোজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ায় ধসা লাগা নিবারিত হয়। ঘুঁটের ধোয়া প্রতিদিন দিলে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু গন্ধক সপ্তাহে একদিন দিবে। মিশ্রসার অর্থাৎ বিটিলটোন্ দিয়া চারা বসাইলে কোনরূপ পোকা ধরিবে না। পোকা ধরা বরোজেও ঐ সার ব্যবহারে পোকা নিবারিত হয়।

১০। **আয় ব্যয়**—এক বিঘা জমিতে বরোজ করিতে হইলে প্রথম বর্ষে এক শত টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অল্প ভূমি অপেক্ষা অধিক জমির ব্যয় অল্প লাগিবে একারণ একযোগে দশ বিঘা জমিতে পান লাগাইতে পারিলে খুব সুবিধা হয়। এক বিঘা জমিতে বরোজ হইতে আমরা অন্যূন ২৫ লক্ষ পান পাতা সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি। টাকায় ৩০০ পান পাওয়া গেলে এক বিঘা জমিতে বৎসরে ৮০০ টাকা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি দ্বিতীয় বৎসর হইতে ৫০০—৭০০ টাকা খরচ বাদ লাভ থাকে। ইহা একটী

বিশেষ লাভজনক কৃষি। আশা করি বাংলায় বেকার যুবকগণ জমি সংগ্রহ করিয়া এই পান চাষ করতঃ জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া গোলামী বর্জ্জন করিবেন।

১১। সাবর পান চাষের প্রণালী নিম্নে দেওয়া হইল।—বরোজের চারিদিকে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা, মাথার উপরে চাল ও সমস্ত ঘরটী উলু খড় দিয়া পাতলা ছাওয়া; জমির পরিমাণ ৭ কাঠা মাত্র। মাটী বেলে দোঁয়াশ ২॥০ ফিট দূরে এক ফিট্ অন্তর মাদা করা হইয়াছে। পুকুরের পাক্‌মাটি আনিয়া এই মাদাটী ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি উচু করা হইয়াছে। মাদার পরিসর ১ ফুট মাত্র। বরোজের মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারিবে, মৃদু সূর্য্যালোক ও অল্প উত্তাপ প্রবেশ করিবে এরূপ ব্যবস্থা করাউচিত। প্রখর আলো বা রৌদ্রে পানের পাতা জ্বলিয়া যাইবে। পানের বেশী সবুজ ও সরস পাতাই চর্ব্বণের উপযোগী এবং তাহাই আদরের। এই প্রকারের গাছঘর না থাকিলে বায়ুর বেগ রক্ষা করা যায় না। অনাবৃত স্থানে পানের গাছ থাকিলে, প্রবল বাতাসে ক্ষতি হয়। বরোজের ঘর সাধারণতঃ ৫॥০—৬॥০ ফিট্ উচু হয়। মানুষ তাহার ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে এরূপ উচু করা হয়। গাছ ঘর প্রস্তুত করিয়া পরে পান বসান হয়। ঘর ৮—১০ বৎসর টেকে প্রতি বৎসরই ঘর মেরামত ও উলু পাল্টাইয়া ছাওয়া আবশ্যক হয়। তিন বা ততোধিক বয়সের গাছের ডগা ছাঁটিয়া জমিতে বসাইলে

পান গাছ হয়। ডগাটি ১ ফুট লম্বা এবং ৪।৬টী পত্র-গ্রন্থি চাই। এই গ্রন্থি-মুখ হইতে নূতন ফাঁকড়া বাহির হইবে। ফাল্গুন মাসে মাদায় কাত ভাবে শোয়াইয়া চারা বসান বিধি। মাদার একধার হইতে ৪।৫টী ডগা কাটা বসাইয়া, আবার ১২ কিম্বা ১৬ ইঞ্চি তফাতে আবার ৪।৫টী ডগা কাটা বসাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ হিসাবে ডগা বসাইলে এক বিঘা জমিতে আবাদ করিবার জন্য ১৫০০ ডগার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মাদাতে ৪।৫ বার জল দিয়া 'কাটিং' গুলি সজীব রাখিতে হইবে। প্রায় ১ মাস কাল এইরূপে দিবার পর তবে শিকড় বাহির হইয়া ডগাগুলি গজাইতে থাকে। অতঃপর গোড়ায় মাটি দিয়া ডগার নিকটে বাখারির বেড়া পুতিয়া দিতে হয়। ডগাগুলি লতাইবার সুবিধার জন্য কুশ ঘাস দিয়া বাখারি চটার সহিত ৪।৫ ইঞ্চি অন্তর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সময় হইতে সপ্তাহে দুই দিন জল দেওয়া হয়। বৃষ্টির সময় জল দিবার আবশ্যক হয় না। পৌষ মাসে ও জল দেওয়া হয় না। পৌষমাসে ডগাগুলি প্রায় ৪ ফিট লতাইয়া উঠে। পান গাছের ২ ফিট্ পর্য্যন্ত নিম্নের পাতাগুলি বিক্রয় জন্য ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়; এবং পানের লতাগুলি নামাইয়া লইয়া জমিতে মাটি চাপা দিয়া পুতিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই লতাগুলি পোতার মাঝে যে ১২ ইঞ্চি হইতে ১৬ ইঞ্চি ফাঁক রাখা হইয়াছে তাহা পানের ডগায় পূর্ণ হইয়া যায় এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাঁশের চটা পুতিয়া

দিবার আবশ্যক হয়। গাছ বছরে দুইবার নামাইয়া মাটি চাপা দেওয়া হইয়া থাকে। ভাদ্রে একবার ও ফাল্গুনে দ্বিতীয় বার।

১২। **সার**—পানের জন্য এ অঞ্চলে পাক্‌মাটি ও সরিষার খৈল কেবলমাত্র ব্যবহার করে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ৪ বার খৈল দেয়, বিঘা প্রতি ৪০/মণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। বরোজের কথা বলিতেছি এইরূপ একটী বরোজের জন্য ২ জন মজুরের প্রতিদিনের কার্য্য আছে কখনও নিড়ান, কখনও জল দেওয়া, কখনও সার দেওয়া, পানের লতা বাঁধা, ডগা নামাইয়া বসান, বরোজের ঘর মেরামত একটা না একটা কার্য্য আছেই।

প্রত্যেক গাছ হইতে মাঝে দুইবার পান ভাঙ্গা হয়। এবং প্রত্যেক বারে প্রত্যেক লতা হইতে ৮টা পাতা পাওয়া যায়। বৎসরে এক বিঘা জমিতে ২৫ লক্ষ পাতা পাওয়া যায়। নূতন বরোজ একবার তৈয়ার করিয়া লইতে পারিলে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত পান পাওয়া যায়।

১৩। **২৪ পরগণায় পানচাষের পার্থক্য**—২৪ পরগণায় পানের বরোজের চারিদিকে পাকাটি বা ধঞ্চে কাটিয়া বেড়া দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে বাঁশের চটার খুঁটি দেও য়াহয় মাত্র। এখানে বরোজ ৪ ফিটের অধিক উচু করা হয় না। লোকে কষ্টে হেঁট হইয়া ভিতরে যাতায়াত করিতে পারে। এ অঞ্চলের লোকের ধারণা অধিক উচু করিলে পান গাছের

ক্ষতি হইবে, এবং হাওয়ায় বরোজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। উচ্চ করিলে পান খারাপ হইবে না, তবে বেশী হাওয়া লাগিলে বরোজ ভাঙ্গিতে পারে এই কারণেই আমি যশোহর ও খুলনায় বরোজ প্রথা যাহা লিখিয়াছি তাহাই শ্রেষ্ঠ। এখানে বারুইগণ বৎসরে দুইবার গাছ নামাইয়া নূতন ও পুরাতন উভয় গাছের গোড়াতে শুষ্ক পাক্‌মাটি দেয়।

এখানকার বরোজের কাঠাম এড়ো এড়ো গড়ানের সরু কচা পুতিয়া লয়। তাহার উপর দিয়া লম্বা বাঁশের চটা লাগাইয়া কাঠাম করে। চালেও পাকাটি দেয় ও উলুখড় দিয়া চারিদিক ছায়। ডগা বসাইয়া ৪।৫ দিন জল দেয়। ও একবার জলেই যথেষ্ট। দুই মাস অন্তর একমাসে ২বার সেচ্‌ দেয়। এখানকার বারুইরা পাকাটি দ্বারা পান লতা উঠায় এবং পান হইতে ফেকড়া বাহির হইলে তাহা নামাইয়া মাটি চাপা দিয়া নূতন চারা তৈয়ার করিয়া লয়। ইহারা অশুচি কাপড়ে বরোজে যায় না, বলে পোকা হয়। সমগ্র বাংলায় যত লোক পান চাষ করে তাহার মধ্যে যশোহর ও খুলনার বারুজীবীরাই উন্নত প্রকৃতির চাষ করে।

১৪। পানের রোগ।

পানের রোগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—স্মরণাতীত প্রাচীন

কাল হইতেই বাংলাদেশে পানের চাষ হইতেছে। যে সকল জমিতে বন্যার জল উঠে না অথবা যে সকল জমি হইতে বৃষ্টির জল নিঃসারিত হয়—আদৌ জল সঞ্চিত হয় না, এইরূপ উচ্চ ভূমিতেই পানের চাষ হইয়া থাকে। কেননা জমিতে জল বাঁধিলে পানগাছ বাঁচে না। পান বহুবর্ষজীবী লতা-জাতীয় গাছ; এবং ইহা সরস ও ছায়াযুক্ত মৃত্তিকায় উত্তম জন্মে। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই পানলতার কর্ত্তিতাংশ রোপন করা হয় বলিয়া, তৎকালে জলসেচ করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ, বৃষ্টির জলে রোপিত-লতাংশের পরিবর্দ্ধন কার্য্য সাধিত হয়। কিন্তু আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে পানলতার কর্ত্তিতাংশ রোপণ করিলে, উহার গোড়ায় জলসেচন করিতে হয়। পান-লতার ক্ষুদ্র কর্ত্তিতাংশ বড় হইয়া লতাগাছে পরিণত হইলে, উহাতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত পান ধরিয়া থাকে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এক প্রকার পচারোগ বাংলা-দেশের পানের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বরায়াঢালা নামক স্থান হইতে এই রোগের খবর প্রথম পাওয়া যায়। তৎপর বাংলার যে সকল জেলায় পানের চাষ হয়, সেই সকল জেলা হইতেও ক্রমশঃ ঐ রোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যে সকল স্থানে পানের চাষ হয়, সেই সকল স্থানেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রোগের লক্ষণ—রোগাক্রান্ত-পান গাছের পাতার রং ফেঁকাশে (pale) হইয়া যায়, এবং সেগুলি ঢলিয়া পড়ে। কখন কখন সবুজ পাতা ঢলিয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। মৃত্তিকার অব্যবহিত ঊর্দ্ধ বা নিম্নস্থ পানগাছের ডাঁটা (stem) সর্ব্বাগ্রে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তদবস্থায় ঐ স্থানটি পরীক্ষা করিলে একটি কাল দাগ দেখা যাইবে, এবং স্থানটি অপেক্ষাকৃত নরম বলিয়া মনে হইবে। আক্রান্ত স্থানের উপরিভাগ লোহিতাভ বাদামী রংয়ের মতও হইতে পারে। রোগাক্রান্ত ডাঁটা কাটিলে, উহার ভিতরের শিরাগুলিতেও বাদামী বা লালাভ বাদামী রংয়ের (redish brown) সরু সরু রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং উহার অভ্যন্তর ভাগও নরম বোধ হয়। অধিকাংশ স্থলেই মৃত্তিকার অতি সন্নিকটে অর্থাৎ মৃত্তিকার প্রায় এক ইঞ্চি বা অল্লাধিক এক ফুট উপরেও উক্ত রোগের উদ্ভব হইতে দেখা গিয়াছে। শীত-কালে রোগোৎপাদক উদ্ভিজাণুগুলি মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ মূলাংশে (underground parts) অবস্থিতি করে। বর্ষাকালেই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যাধিক হয়; এবং তৎকালেই উহা বরো-জের মধ্যে ব্যাপকভাবে (epidemic form) বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলে, বরোজের রোগাক্রান্ত পান গাছগুলিও দ্রুত মরিয়া যায়।

পানগাছের উক্ত 'ঢলিয়া যাওয়া' রোগ তিন প্রকার। পরাঙ্গ-পুষ্ট-ছত্রক (parasitic fungi) দ্বারা সংঘটিহ হয়।

যথা—'Rhizoctonia', 'Schlerotium Rolfsii' এবং 'Phytophthora'।

পুসা-কৃষি-কলেজের উদ্ভিজ্জণুতত্ত্ববিদ্ (The Imperial Mycologist. Pusa) এবং ঢাকা-কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রের ছত্রকরোগ সম্বন্ধীয় গবেষণাকারী কর্ম্মচারী— ইঁহারা উভয়েই উক্ত ত্রিবিধ প্রকার ছত্রকের মধ্যে কোনটি পানগাছের কি পরিমাণ অনিষ্টসাধন করে, এবং উহাদের প্রত্যেকটি কিরূপ অবস্থায় মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পায়, সেইসকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

প্রতীকারোপায়—উক্ত রোগ দমন করিবার দুইটি উপায় আছে, যথা :—

(১) যে স্থানে প্রথমতঃ রোগের উদ্ভব হয়, সেই স্থান অর্থাৎ মৃত্তিকাভ্যান্তরস্থ ও মৃত্তিকা হইতে এক ফুট উপর পর্য্যন্ত ডাঁটা, এমন একটি পদার্থে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে ছাতা-রোগের বীজ বা উদ্ভিজ্জাণু ঐ স্থানে জন্মিতে না পারে।

(২) যে জাতীয় পানগাছে উক্ত রোগ নিরোধ-শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই জাতীয় পানের চাষ করা।

এই দুইটি উপায়ের মধ্যে প্রথমটি আমাদের জানা আছে। এবং সকলেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করা সময় সাপেক্ষ। আমাদের বাংলাদেশে উক্ত রোগে প্রতি বৎসর পান-চাষীর যে প্রভূত

আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহাতে প্রথমোক্ত উপায়টি আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই অবিলম্বে পরীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পানগাছের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ও মৃত্তিকার উপরিভাগস্থ এক ফুট পর্য্যন্ত ডাটায় "রজন-মিশ্রিত বর্দ্দো মিকশ্চার" (one p. c. Resin Bordeaux mixture) হস্তচালিত সিঞ্চন-যন্ত্র (spayer) দ্বারা বেশ ভালরূপে লাগাইতে হইবে। বর্ষার প্রারম্ভেই বরোজের প্রত্যেকটি গাছের ডাটা এই ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া দিতে পারিলে বেশ সুফল পাওয়া যাইবে। বৈশাখ মাসের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী—বোর্দ্দো মিকশ্চার প্রস্তুত করিতে তুতিয়া (copper sulphate) এবং কলিচূণ (Quick lime) এই দুইটি জিনিষ আবশ্যক।

পরিমাণ—

তুতিয়া	৬ ছটাক ২ তোলা,
কলিচূণ	৬ ছটাক ২ তোলা,
জল	১/০ মণ।

একটি মাটির বা কাঠের গামলায় আধ মণ জল লইয়া তাহাতে তুতিয়া ভিজাইতে হইবে। একটি ছোট ছালায় তুতিয়া রাখিয়া ঐ ছালাটি পাত্রের জলে ঝুলাইয়া রাখিলেই খুব শীঘ্র গলিয়া যায়। পাথরচূণ অন্য একটি পাত্রে অল্প অল্প

জল দিয়া সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া লইলেই কলিচূণ প্রস্তুত হয়। ঐ কলিচূণের সহিত অবশিষ্ট জল মিশাইয়া ঘুটিয়া লইতে হইবে। তৎপর তুতিয়া-গলান জলের সহিত চূণমিশ্রিত-জল একত্রে মিশ্রিত করিলেই 'বোর্দ্দো' মিকশ্চার প্রস্তুত হইল। এই ঔষধ ঠিকরূপে তৈয়ার হইয়াছে কি না, তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে! একখানা চক্‌চকে ছুরির ফলা ঔষধটিতে কিছুক্ষণে ডুবাইয়া রাখিলে যদি তাহাতে তামাটে-রঙ্গের দাগ লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঔষধে আরও চূণ দিতে হইবে। নতুবা উহা ব্যবহার করিবার উপযোগী হইবে না।

'বোর্দ্দো মিকশ্চার প্রস্তুত হইলে পরে উহার সহিত রজন যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে "রজন-মিশ্রিত বোর্দ্দো মিকশ্চার" প্রস্তুত হইয়া থাকে। রজন প্রস্তুত বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কাপড়-কাচা-সোডা	২ ছটাক ৩ তোলা
রজন	৩ ,, ৩ ,,
জল	দেড় সের

কোন পাত্রে জল রাখিয়া, প্রথমতঃ উহা আগুনের জ্বালে ফুটাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে উহার সহিত সোডা মিশ্রিত করিতে হইবে, এবং সোডা গলিয়া গেলে, উহাতে অল্প অল্প করিয়া রজন-চূর্ণ (রজন বেশ গুঁড়া করিয়া লওয়া লওয়া আবশ্যক) ছাড়িয়া দিতে ও নাড়িতে হইবে। আধ

ঘণ্টা ফুটাইবার (এই আধ ঘণ্টাই অনবরত নাড়িতে হইবে) পরে পাত্রটি আগুনের জ্বাল হইতে নামাইয়া লইবে এবং পাত্রস্থ রজনাদি ঠাণ্ডা করিতে হইবে। তৎপরে সেগুলি বোর্দ্দো মিকচারের সহিত যোগ করিতে হয়। তাহা করিলে পান গাছের ডাঁটায় ছিটাইয়া দিবার ঔষধ প্রস্তুত হইল।

১৫। পানের সংক্রামক রোগ।

পানের চাষ বাঙ্গালাদেশে অতি লাভজনক। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এক প্রকার সংক্রামক রোগ (মড়ক) এই পান চাষের অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে, এবং সেই কারণে অনেক পানচাষি উক্ত লাভজনক ফসলের আবাদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে একবার করিয়া পান গাছে পিচ্‌কারী দ্বারা এক প্রকার ঔষধ ছিটাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় এবং ঐ রোগ দমন রাখা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত ঔষধ রোগের প্রতিকার করে বটে, কিন্তু রোগ না হয় তজ্জন্য বরোজের জমির জল যাহাতে সহজে এবং শীঘ্র বাহির হইয়া যায় এবং আলো ও বাতাস ভালরূপে খেলে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। বরোজ খুব পরিষ্কার রাখা এবং মরা লতাপাতা ইত্যাদি দূরে লইয়া পাড়াইয়া ফেলা দরকার।

যে ঔষধ ছিটাইতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপে তৈয়ার করিতে হয়ঃ—

এক মণ ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম।

তুঁতে	০০	০০	৬ ছটাক ২ তোলা।
পাথরের চূণ	০০	০০	৬ „ ২ „
জল	০০	০০	১ মণ।

প্রথমতঃ তুঁতে একটি ছালার টুকরায় বাঁধিয়া মাটির কিংবা কাঠের গামলাতে আধ মণ জল দিয়া উক্ত জলের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং অন্য একটি পাত্রে চূণ রাখিয়া অল্প অল্প জল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইবে। এরূপ সমস্ত চূণ ফুটাইয়া গেলে তাহাতে আধ মণ জল মিশাইয়া চূণ ভাল করিয়া গুলিয়া দিবে। পরে উক্ত চূণের জল ও তুঁতের জল একত্র মিশাইয়া পিচ্‌কারী দ্বারা ছিটাইতে হইবে।

উক্ত ঔষধ ঠিকরূপে তৈয়ারী হইল কি না তাহা দেখিবার জন্য উত্তমরূপে তৈয়ারী ঔষধের মধ্যে একখানা পরিষ্কার চক্‌-চকে চাকুর ফলা ডুবাও। এক মিনিট পর যদি উক্ত চাকুর ফলার উপর তামাটে রং দেখায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আরও চূণের জল দরকার। সুতরাং চাকু ডুবাইলে যে পর্য্যন্ত উহার উপর তামাটে রং না দেখায়, সেই পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে আরও চূণের জল দিতে থাকিবে। ঔষধে চূণের ভাগ কম হইলে উক্ত ঔষধ গাছের পক্ষে অনিষ্টকারী।

পরে নিম্নলিখিত ঔষধটি উল্লিখিত ঔষধের সঙ্গে মিশাইতে

হইবে। কারণ ইহা মিশাইলে বর্ষার সময় ঔষধ সহজে বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায় না।

কাপড় কাচা সোডা	∘∘		∘∘	২ ছটাক ৩ তোলা।
রজন	∘∘	∘∘	∘∘	৩ „
জল	∘∘	∘∘	∘∘	/১॥৹ সের।

প্রথমতঃ জল ফুটিলে তাহাতে সোডা মিশাও। সোডা গলিয়া গেলে উহাতে গুঁড়া রজন অল্প অল্প করিয়া দিয়া অনবরত নাড়িতে থাক ও আধ ঘণ্টা ফুটাও। ঠাণ্ডা হইলে এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত এক মণ ঔষধের সঙ্গে মিশাও। এই মিশ্রত ঔষধ পিচ্‌কারী দ্বারা ছিটাইবার পূর্ব্বে চালুনি দ্বারা ছাকিয়া লইবে। মাটি হইতে লতার এক হাত উপর পর্য্যন্ত ঔষধ ছিটান দরকার। কেলের দু'পাশের মাটিও ঔষধ দ্বারা ভিজান প্রয়োজন। বৃষ্টির জলে যদি ঔষধ ধুইয়া যায় তবে পুনরায় ছিটান প্রয়োজন।